হিপোক্রেট

রুমানা বৈশাখী

প্রথম গল্পটি শুরু হয় ভালোবাসা পেতে ব্যাকুল এক নারী হৃদয়কে নিয়ে। যে সুখের স্পর্শ পেতে বেছে নেয় পরকীয়ার আবরণ। অথচ দিন শেষে নিজের অস্তিত্বই অপবাদ দেয় তাকে – *হিপোক্রেট*।

বইয়ের প্রতিটি গল্পেরই কোথাও না কোথাও উঠে এসেছে জীবনের পরতে পরতে জড়িয়ে থাকা রূঢ় সত্য। অর্থ-বিত্তের ঝলকানি যে আড়াল করে দিতে পারে অতীতের জঘন্যতম অপরাধকেও – সেই কাহিনী বর্ণিত হয় *একজন রাজাকার মারা গেছে*। *ইসকুল* বলে আমাদের চরম আধুনিক জীবন–যাপনের কথা, গ্রামে ফেলে আসা শেকড়ের কথা। *জনৈক জিল্লু হোসেন* গল্পটি একজন নিঃসঙ্গ মানুষের সত্য কাহিনী। যে অপেক্ষা করে পরিবার এবং ভালোবাসার।

দাফনের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করেন পাঁচ সন্তানের জননী মমতা বেগমও –*মমতা বেগমের বাক্স* গল্পে এবং সবশেষে *পিঞ্জিরা*–তে উঠে আসে সোনার খাঁচায় বন্দী জীবনের একমাত্র সত্য অনুভব... ভালোবাসা!

দৈনন্দিন দিন যাপনের অত্যন্ত সাধারণ কিছু গল্প নিয়ে এ বই *হিপোক্রেট*।

রুমানা বৈশাখী

হি পো ক্রে ট

জাগৃতি প্রকাশনী

রুমানা বৈশাখী

হিপোক্রেট

প্রথম প্রকাশ	ফেব্রুয়ারি ২০০৮
প্রকাশক	ফয়সল আরেফিন দীপন জাগৃতি প্রকাশনী ৩৩ আজিজ সুপার মার্কেট নীচতলা, শাহবাগ, ঢাকা ১০০০
কার্যালয়	৪২/এ আজিজ সুপার মার্কেট ২য় তলা, শাহ্‌বাগ, ঢাকা-১০০০
প্রচ্ছদ	ফয়সল আরেফিন
শব্দবুনন	নুরুজ্জামান, জাগৃতি
মুদ্রণ	রিকো প্রিন্টার্স নীলক্ষেত, কাটাবন, ঢাকা
মূল্য	**নব্বই টাকা**
ISBN	984 70087 0003 4

উ ৎ স র্গ

আমার মা
আমার বাবা

জাগৃতি প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

দুঃস্বপ্নের রাত

জেনেসিক্স রাশিমালা

হিপোক্রেট

এক.

'আহ্‌হা, তা কেন হতে যাবে?' নাসরিনের কথাগুলোর জোর প্রতিবাদ করেন মিসেস রহমান। জেসমিন রহমান।

শরীরে জড়ানো দামী শাড়িতে ঝিলিক তুলে বেশ একটা গর্বিত ভঙ্গি করে বলেন, 'আমার স্বামী তো ভাই এখনও আমাকে ছাড়া কিছু বোঝেন না। রাতের বেলা আমি বিছানায় শুতে না এলে তার তো ঘুমই হয় না!'

বাক্যগুলোর আদি রসাত্মক গন্ধটুকুর জন্যে হেসে ওঠে প্রায় সবাই। বেচারী নাসরিনও তাল মেলাতে ঠোঁটের কোন বাঁকা করে একটু। প্রায় পঁচিশ/ত্রিশজন নারী আছে এখানে। সকলেই বিবাহিতা এবং বাচ্চার মা। আর দেখা করবার উপলক্ষ্যটা তৈরি হয়েছে বাচ্চাদের স্কুল ফাংশনের মাধ্যমে। অবশ্য সবার সাথেই সবার কমবেশি দেখা তো প্রতিদিনই হচ্ছে।

অন্য সময় হলে হয়তো ভালোই লাগতো ইয়াসমিনের, কিন্তু আজ লাগে না। বেশ একটা রসালো বিষয় নিয়ে আলাপ হচ্ছে "স্বামী"। সকলেই এমন সব গল্প বলছে যেন তাদের স্বামী সুখের কোনো অন্ত নেই। অথচ সকলেই জানে যে এসব কথার ৯৯ ভাগ হচ্ছে নিরেট চাপা। এত বছর ঘর করার পর, ছেলে পুলের বাবা-মা হবার পর যদি এরা দাবি করে যে স্বামী তার প্রেমে পাগল কলেজের ছেলেদের মতো– তাহলে সেটা চাপা ছাড়া আর কি?

এই যে মিসেস রহমান এত গর্ব করলেন, উপস্থিত প্রতিটি মহিলাই বোধ হয় জানে যে ২২/২৩ বছরের এক তরুণীর সাথে প্রেম আছে তার স্বামীর। ভদ্রলোক চালাকও বটে। কারণ ঘরের বউকেও কেমন সুন্দর ম্যানেজ করে রেখেছেন। সব জেনে শুনেও মিসেস রহমান...

'আসলে কি জানেন, নিজের বউয়ের কাছ থেকে ভালোবাসা পেলে পুরুষ মানুষ আর অন্যদিকে মন ফেরায় না।' বলে মিসেস নবনীতা রায়। 'আমি তো সর্বক্ষণ আমার সাহেবকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টাই করি।'

'ঠিকই, ভাবী! আমরা মেয়েরা যদি নিজের চেহারা আর শরীরটা একটু মেইনটেইন করে রাখি, তাহলেই হয়। আমাকে দেখুন না; উনি বলেন আমি নাকি এখনও বিয়ের দিনের মতোই সুন্দর।'

মিসেস রায়হানের কথা শুনে হাসি যে কিভাবে লুকাবে, সেটাই বুঝতে পারে না ইয়াসমিন। চাপা যে কত প্রকার হতে পারে! নবনীতা স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টাটা

বকাঝকা আর ধমকের মাধ্যমে করে, সেটা তো ইয়াসমিনের নিজের চোখেই দেখা। আর মিসেস রায়হান? সে কি জানে যে তার স্বামীর পরকীয়া চলছে নবনীতার সাথে? এত না নিজেকে স্লিম আর সুন্দর রাখেন। তাহলে অমন কালো আর ভারী শরীরের নবনীতাকে ওনার স্বামীর এত মনে ধরে কেন?

বেচারী নাসরিন! স্বামীকে নিয়ে ছোট্ট একটা আফসোস করতে গিয়ে এতগুলো মহিলার গাল-গল্পের মাঝে ফেঁসে গেছে। অবশ্য এদেরকে খুব একটা দোষও দিতে পারে না ইয়াসমিন। সাংসারিক জীবনের ব্যক্তিগত অসুখটাকে সকলের সামনে এনে কেউ-ই নিজেকে ছোট করতে চায় না। কারণ সেটাই তখন হয়ে দাঁড়াবে অন্য মহিলাদের গসিপের মসলাদার বিষয়বস্তু। এইসব আটপৌরে গৃহিনীরা–যাদের পরিচয় শুধু স্বামীর পরিচয়ে; আর সোসাইটিতে সম্মান নির্ভরশীল স্বামীর দেয়া শাড়ি গয়না নামক ভালোবাস্যার (!!) ওপর– তারা কেন অযথা চাইবে সম্মান হারাতে? পরকীয়া আছে বেশির ভাগেরই। তবে সাহসী পরকীয়া নয়, অধিকাংশই হচ্ছে টেলিফোন প্রেম। চার দেয়ালের ঘেরাটোপের মধ্যে থেকেও টেলিফোনের মাধ্যমে এইসব নারীরা খুঁজে নেয় কিশোরী-তরুণী বয়সের সেই প্রেমে পড়ার আনন্দ; একটু খানি সিনেম্যাটিক ভালোবাসা; এক ধরনের কষ্ট কষ্ট সুখের মাঝে দৈনন্দিন একঘেয়ে জীবনটাতে বেঁচে থাকার অবলম্বন। যারা একটু সাহসী। তারা খুঁজে নেয় শারীরিক ভালোবাস্যার। নিজের মত করে জীবনের অর্থ খুঁজে নেয়া যেন।

ধূর!

নিজের ওপরই বিরক্ত লাগে। কি দরকার অযথা এতসব চিন্তা করে? যা চলছে; তা কি বদলে যাবে? তার চাইতে চলুক না!

'...আমার সাহেবকে নিয়ে আমি তো আপা ভীষণ সুখী। উনি এখনও বিছানাতে যা করেন না...'

আর শুনতে ইচ্ছা হয় না। স্কুলের হল ছেড়ে বের হয়ে যায় ইয়াসমিন। আরে, স্বামী শারীরিকভাবে খুশি করতে পারে তো বয়ফ্রেন্ডের কি দরকার? প্রায়ই তো এখানে-সেখানে ঘনিষ্ট অবস্থায় দেখা যায়–এক নয়, একাধিক পুরুষের সাথে!

কি যেন নাম মেয়েটার? মিসেস আশফাক চৌধুরী। আসল নামটা কি? কি যেন নাম!

মনে আসে না। "মিসেস" পরিচয়ের আড়ালে হারিয়ে গেছে মেয়েটার বাবা মায়ের দেয় নাম পর্যন্ত।

বাইরে উজ্জ্বল রোদ গ্রীষ্মের। পুরো শরীর চিড়বিড় করে ওঠে। কেন যেন মনটাও। কতদিন দেখা হয় না রবিনের সাথে? কতদিন কাটানো হয় না চমৎকার কিছু ভালোবাস্যার মুহূর্ত?

দুই.

ভালোবাসা!

জটিল একটা শব্দ। প্রহেলিকাময় শব্দ। কে কবে এই শব্দের মানে বুঝতে পেরেছে?

মনের অলিতে-গলিতে আঁতিপাতি করে খোঁজে ইয়াসমিন। অবশ্য জবাবটা ঘুরে ফিরে একই আসে। রবিনকে "বোধহয়" ভালোবাসে সে। সত্যিই ভালোবাসে। না বাসলে কৈশোরের সেই ভালো লাগ্যার মানুষের সাথে বিয়ের আট বছর পরও সম্পর্ক রাখা কেন?

বিশ বছরে বিয়ে হয়ে গিয়েছিল তার। পরিবারের পছন্দে, তার মতামতের কোনো পরোয়া না করেই। অবশ্য ইয়াসমিনের যে খারাপ লেগেছিল ব্যাপারটা, তা-ও নয়। প্রেম-ভালোবাসা জীবনে আস্যার আগেই স্বামী হয়ে জাহিদ এসেছিল জীবনে, তাই প্রথমবারের মতো জীবনে প্রেমিক হয়ে উঠলো সেই পুরুষটাই। প্রথম প্রথম শারীরিক ভালোবাস্যার বিনিময় আর দৈনন্দিন জীবনে পাশাপাশি থাকাটা বোধহয় আপনা-আপনি একটা সম্পর্ক তৈরি করে দেয় দুজন মানুষের মাঝে।

বিয়ের এক বছরের মাঝে ছেলে রাহুল এলো জীবনে। জাহিদের সাথে ইয়াসমিনের বয়সের ফারাক বেশি নয়, বছর পাঁচেক মাত্র। তবুও কীভাবে যেন দাম্পত্য থেকে তারুণ্য ক্রমশ বিদায় নিয়ে নিল। আসলে যৌথ জীবনের প্রাথমিক উচ্ছ্বাসটা কেটে যেতে জাহিদ ফিরে পেলো নিজের আসল রূপ। অফিসটা করছে কোনোরকম, বেশিরভাগ সময় কাটাচ্ছে বন্ধুদের সাথে হৈ চৈ করে। বাসায় যতক্ষণ থাকে, প্রতি মুহূর্তে তার সঙ্গী টেলিভিশন নামক যন্ত্র। তা সে যেরকম অনুষ্ঠানই চলুক না কেন। এর ফাঁকে ফাঁকে রাহুলকেও সময় দেয় কখনো।

ব্যস! এসব ছাড়া আর কোনো কিছুতে জাহিদের আগ্রহ নেই। একটা জরুরী আলাপ মানুষটার সাথে করা যায় না, সুখ-দুঃখের দুটো অনুভবও না। আবেগী কিছু বলার পর মানুষটা যখন নিরুত্তাপ থাকে, তখন কেমন যেন নিজেকেই ছোট মনে হয়। মানুষটা মাঝে মধ্যে বিছানায় ডাকে তাকে। মাস ছয়েক হলো সেই রুটিন মাফিক জৈবিক বিনিময়ও বন্ধ।

অবশ্য ভালোই হয়েছে। রবিনের সাথে সম্পর্ক হবার পর থেকে জাহিদের স্পর্শে কেমন যেন গা ঘিনঘিন করতো। রবিনও খুব অভিমান করতো ব্যাপারটা নিয়ে। কিন্তু এখন যখন...

ভাবতে ভাবতেই মুঠোফোনে ডায়াল করে রবিনের নম্বর। রিং পড়তে পড়তে বিচ্ছিন্ন হয় সংযোগ, কল রিসিভ হয় না। ব্যস্ত হয়তো! আজকাল প্রায়ই এমন হচ্ছে। কখনও কখনও স্যারাদিনে একবারও মানুষটার নাগাল পাওয়া যায় না।

যে নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তি পেতে রবিনের সাথে মন বিনিময়, ঘুরেফিরে আবার তার সাথেই বসবাস। প্রথম প্রথম অবশ্য অন্যরকম ছিল। রোজ দুপুরেই উচ্ছল সময়

কাটতো রবিনের সাথে–ওর ফ্ল্যাটে। কিংবা টেলিফোনে।

জানালা গলে বিছানায় এসে পড়া শেষ দুপুরের রোদটুকুন যেন জ্বালা ধরায় শরীরে; রবিনের স্পর্শের স্মৃতি হয়ে। তাড়াতাড়ি পা জোড়া ছায়ায় টেনে নেয় ইয়াসমিন। বুকের মাঝে একাকীত্বের ঘুনপোকার কুড়ে কুড়ে খাওয়া অনুভব। একটু খানি মানব সঙ্গের জন্য যেন ছটফট করে মুমুর্ষ প্রাণ পাখি।

অগত্যা মুঠোফোন ডায়াল হয় নাসরিনের নম্বরে। একমাত্র বান্ধবী! অন্তত এ মানুষটার সামনে তাকে স্বামী-সুখ নিয়ে মিথ্যা গল্প বলতে হয় না।

গল্প চলে এদিক-ওদিককার।

আজকের স্কুল ফাংশন থেকে শুরু করে বাজারে মুরগীর দর। নবনীতার শাড়ি থেকে ঘুরেফিরে আসে নাসরিনের স্বামীতে। এবং তারপর...রবিন!

'তোর কপালের জোর আছে রে, দোস্ত!' বলে নাসরিন। 'এতো হ্যান্ডসাম বয়ফ্রেণ্ড আছে আর কারও? আমি তো এত বছরেও একবার সত্যিকারের ভালোবাসা পেলাম না।' জবাবে হাসে ইয়াসমিন, 'আসলেই! রবিনের মতো ছেলের জন্যে একুশ/বাইশের মেয়েরা পাগল। সব ফেলে কেন যে আমাকে ভালোবাসে!'

'একেই বলে রিয়েল লাভ! কত হবে রে ওর বয়স? তোর ক্লাসমেট ছিল না স্কুলে?'

'হুঁ। বছর দুয়েকের মত বড় হবে আমার চাইতে।'

'ইস! আমার তো হিংসায় মরে যেতে ইচ্ছা করে তোকে দেখলে। আচ্ছা, রবিন বিয়ের কথা বলে না?'

'বলে না আবার। সর্বক্ষণ বলে! আমিই আসলে আর একটু গুছিয়ে ওঠার সময় দিচ্ছি ওকে।'

'আর কি গোছাবে রে? ভালো একটা চাকরি করে, ত্রিশের কাছাকাছি বয়স হয়েছে। বিয়েটা এবার করেই ফেল!'

'কিন্তু ওর ফ্যামিলি? আফটার অল আমি একটা ম্যারিড মেয়ে!'

'শোন দোস্ত, ভালোবাসা থাকলে ওইসব পরিবার-টরিবার কোনো বিষয়ই না। আর রবিন তোকে অ-নে-ক ভালোবাসে।'

'দোয়া করিস, তাই যেন থাকে। ওকে ছাড়া আর কিচ্ছু চাই না আমি জীবনে।'

'আরে দেখবি, সব ঠিক হবে!'

কথা বাড়ে আরও কিছুক্ষণ। কিন্তু ভালো লাগে না আর । অগ্যতা সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয় বন্ধুত্বের।

প্রতিবারই এমন হয়। নাসরিনের সাথে রবিনকে নিয়ে কথা বলার পর আর কিচ্ছু ভালো লাগে না। একমাত্র বান্ধবীর সাথেও কপট কতগুলো সুখের অভিনয় করার পর কেমন যেন একরাশ গ্লানি জড়িয়ে ধরে। তবু কেন যেন রবিনের ব্যাপারে সত্যগুলো আসে না মুখে।

প্রেস্টিজে লাগে?

হবে হয়তো। ভালোবাস্যার পুরুষ আজকাল অনাগ্রহী তার ব্যাপারে, একথা অপর কোনো নারীর সাথে শেয়ার করাটা সহজ কোনো বিষয় নয়।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইয়াসমিন। এখানেও সেই হিপোক্রেসি! আসলে এ পৃথিবীতে একটা স্বচ্ছ, সরল সম্পর্ক বোধহয় কারও সাথে কারও হয় না। অন্তত তার তো নেই; সত্যিকারের একজন বন্ধু পর্যন্ত নেই!

তিন.

আয়নায় নিজেকে ঘুরেফিরে দেখা হয় বারবার। শরীরটা আজকাল বেশ মুটিয়ে গেছে, তবুও নীল-সাদা সুতির শাড়িটা মানিয়ে যায় চমৎকার। সন্তপর্ণে একটু খানি প্রসাধনীও ব্যবহার করে। হালকা লিপগ্লস, চোখ ভরা কাজল আর ছোট্ট টিপটা শ্যামলা বরনের সৌন্দর্যটাকে আজ বাড়িয়ে তোলে বহুগুণ।

মনে আনন্দ থাকলে তা নাকি চেহারা উজ্জ্বল করে– সেজন্যই কি? ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় ঘুমন্ত জাহিদের প্রতিবিম্ব দেখে নিজেকে সংযত করে ইয়াসমিন। আজ অফিস যায়নি রাহুলের বাবা। ভাগিস, রাহুলের স্কুল খোলা আজ! নতুবা কি বলে বের হতো বাসা থেকে? এতদিন পর রবিনের সাথে দেখা হচ্ছে...

আয়নায় নিজের ছায়াটাকে আজ ভালো লাগলেও সংশয় পিছু ছাড়ে না নারী মনটার। রবিন কি আজ তার প্রশংসা করবে? ভালোবাস্যার পুরুষের চোখে মুগ্ধ দৃষ্টি তো সব মেয়েরই মনে প্রাণে কাম্য। অথচ তার এমন কপাল যে সুন্দরী হয়ে জন্মায়নি আল্লাহর দুনিয়ায়। জাহিদ তো মুখের ওপরই অন্য মেয়েদের প্রশংসা করে। আর নিজের বউয়ের সৌন্দর্যের খুঁত বের করে ক্রমাগত।

এত খারাপ লাগে! নিজেকে কি ছোট যে মনে হয় তখন!

অসহ্য স্মৃতিগুলো ফিরে এলেও আজ এ মুহূর্তে হাসতে পারে ইয়াসমিন। যে যাই বলুক, রবিন তো কখনও তাকে কিছু বলেনি। নাসরিন ঠিকই বলে, রবিনের মত পুরুষের ভালোবাসা পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। সত্যিকারের ভালো না বাসলে সাত বছরের বাচ্চার মা এক বিবাহিত মেয়ের সাথে সম্পর্ক রাখার কি দায় পড়েছে তার? যদি আহামরি সুন্দরী হতো কোনো, তাহলে একটা কথা ছিল।

...আটটা বেজে গেছে, আর দেরি করা চলবে না। অগ্যতা ছেলেকে গুছিযে নিয়ে বের হয়ে পড়ে ইয়াসমিন। অবশ্য তারপরও দেরি কিছুটা হয়েই যায়। পথে দেখা হয়ে যায় সুমাইয়ার আম্মার সাথে। সিঁড়িতে।

মেয়েটার জন্য মাঝে মাঝে বেশ খারাপই লাগে। বেহেশতের হুরের মত সুন্দর একটা মেয়ে। অথচ স্বামীটা ইবলিশের ঝাড়। নিজের পরীর মত বউটা ছাড়া বিল্ডিংয়ের বাকি সব মেয়ে মানুষের দিকে এর নজর আছে। প্রায়ই রাতে ড্রাঙ্ক অবস্থায় ফেরে, খুরশীদাকে মারধরও করে তখন। মেয়েটার বাবা-মা বেঁচে থাকলে হয়তো বহু আগে সংসারের মুখে ঝাটা মেরে চলে যেতো।

মনে মনে খুরশীদার জন্য একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইয়াসমিন। আসলে নাসরিনের কথাই ঠিক, ভালোবাসা পেতে কপাল লাগে। এই যে প্রেমহীন জীবন যাপন খুরশীদার–এটা কোনো জীবন হলো? কোনো মানে হয় এমন বেঁচে থাকার?

আজ অবশ্য দাঁড়িয়ে থাকা হয় অন্য কারণে, খুরশীদার কষ্টের কাহিনী শোনার জন্য নয়। বরং পাশের ফ্ল্যাটের সুমনের দৃষ্টির সামনে বলে। দরজা খুলে সরাসরি এদিকেই তাকিয়ে সে। না আছে কোনো দ্বিধা, না আছে জড়তা। অথচ বয়সে অনেক ছোট হবে। সবেমাত্র অনার্স ফার্স্ট ইয়ার।

অন্যদিন হলে ভালো লাগতো না এই দৃষ্টি। কারণ ছেলেটা প্রায়ই চলাফেরার পথে অকারণ ছুঁয়ে দেয়, যেন সংকেত দেয় কোনো কিছুর। কিন্তু আজ ব্যাপারটা অন্য রকম হয়ে যায়। কেন যেন ছেলেটার চোখের মুগ্ধ দৃষ্টি দেখতে ভালো লাগে। নিজেকে কম বয়সী কোনো সুন্দরী মনে হয়।

ছেলেটাকে প্রথমবারের মত একটা হাসি উপহার দিয়ে গন্তব্যে পা বাড়ায় ইয়াসমিন। বুকের মাঝে সুখের বুদবুদ। রবিনের সাথে অনাগত সময়টার কথা ভেবে ভেবে। আর এক ধরনের নিশ্চয়তাও। আজকালকার আধুনিকতম ছেলেদের চোখেও যখন সে সুন্দরী, রবিনের দৃষ্টিও তবে আর পার পাচ্ছে না।

চার.

রবিন অবশ্য কখনও নিজ থেকে বলে না সংস্যার পাতার কথা। মাজে মধ্যে সে যদি কখনও কিছু বলে, তার জবাবে শুধু রসিকতা করে টুকটাক। তাও ভীষণ সন্তর্পণে; রসিকতা শেষে নিজের হবু বউয়ের গল্প শুনিয়ে দিতে ভুল করে না কোনো দিনই।

ঘুমন্ত পুরুষটার বুকে সাবধানে মাথা রাখে ইয়াসমিন। নাসরিনের সামনে মিথ্যাগুলো বলতে বলতে কখনও কখনও সে নিজেও বিশ্বাস করে ফেলে। হয়তো এ কারণেই যে মনের কোথাও না কোথাও আস্থা ছিল ভালোবাস্যার ওপর। আশা ছিল সে মানুষটা একদিন হয়তো বদলে যাবে, আর তাকে জাহিদ নামের শৃঙ্খলটা থেকে মুক্ত করে নিয়ে যাবে অন্য কোনো ভূবনে। নতুন করে শুরু হবে জীবন...ভালোবাস্যার ঘরে!

দীর্ঘশ্বাস আসে বুক চিরে। কেন যেন বাস্তবতার আঁচড়গুলো বড় বেশি চোখে পড়ে আজকাল। তবুও, স্বপ্ন সত্যি হবে না জেনেও ছাড়া যায় না স্বপ্নদের পিছুটান। নিজের সামনেই সত্যকে অস্বীকার করা প্রতিনিয়ত। বেশ তো চলছে, চলুক না। যতদিন কাছে পাওয়া যায় রবিনকে! স্রেফ ততদিনই তো স্বপ্নের স্থায়ীত্ব।

'আবার ওইসব হাবিজাবি চিন্তা করছো তুমি?'

সাবধানে দীর্ঘশ্বাস গোপন করলেও রবিনের বোধহয় কান এড়ায়নি। অগ্যতা তাই মানুষটার মন রক্ষা করতে একটুখানি হাসিকে ঠোঁটে স্থান দেয় ইয়াসমিন।

'ভাবছিলাম, তোমার-আমার কথা। সেটা হাবিজাবি হলো?'

'কেন ভাবো ওসব? যা হবে না, তাকে ভেবে কি লাভ?' রবিনের আওয়াজটা কেমন

যেন রূঢ় শোনায়।

তবুও নারী বলে, 'তুমি যদি চাইতে, হলেও হতে পারতো!'

ইয়াসমিনকে বুকের ওপর থেকে সরিয়ে দিয়ে উঠে বসে পুরুষ। এমন ভাবে, যেন শরীর থেকে ঝেড়ে ফেলছে আবর্জনা।

'যা ভালো করেই জানো, সেটা নিয়ে নিয়ে অযথা কেন কথা বাড়াও? তোমার মত বিবাহিতা কোনো মেয়েকে বিয়ে করলে সমাজে মুখ দেখাতে পারবো আমি? বাবা-মাকেই বা কি জবাব দেবো? তুমি হয়তো অত সহজে নিজের সংস্যার ছাড়তে পারবে। কিন্তু আমার পক্ষে সম্ভব নয়...'

'আমার জন্যেও নয়?'

'এসব কথা এখন কেন আসছে, ইয়াসমিন? সম্পর্ক শুরুর সময়ে তো এমন কথা তুমি বলতে না।'

'কারণ তখন তুমি বলতে!'

এবার একটু নমনীয় মনে হয় রবিনকে, 'বয়স তখন কম ছিল আমার...আমাদের দুজনেরই! কি বলতে কি বলেছি–আবেগের বশে! এটা তো এখন বুঝতে হবে, তাই না?'

'তাহলে এই সম্পর্কের পরিণতি কি?'

'কেন, যেভাবে চলছে চলুক না!'

'তোমার বিয়ের পর?'

প্রেমিকাকে কাছে টেনে নেয়ার চেষ্টা করে পুরুষ, 'বিয়ে যখন হবে, তখন দেখা যাবে। তুমি অযথা...'

বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় ইয়াসমিন। কেন যেন অন্তরটা একদম শীতল হয়ে গেছে। ভালোবাসা মানে যদি সুখ হয়, তাহলে যে সম্পর্ক শুধু কষ্টই দেয় তাকে অকারণ পুষে রাখা কেন?

'আজ তানিয়ার জন্মদিন।' এমনভাবে বলে রবিন যেন কিছুই বুঝতে পারেনি। 'চলো, তোমাকে নামিয়ে দিয়ে আসি। দুপুরে লাঞ্চের দাওয়াত আমার তানিয়ার বাসায়।'

মেয়েটাকে চেনে ইয়াসমিন। সাংঘাতিক সুন্দরী। রবিনের ভাষায়–"শ্রেষ্ঠ ফিগ্যার"!

তানিয়ার মুখটা মনে পড়তে বুকের মাঝে কেন যেন জ্বালা ধরে যায়। নীরবে শরীরে জড়ায় শাড়ির বাঁধন। আয়নায় মুখটা দেখে কিছুক্ষণ, প্রসাধনীর বিশৃঙ্খলা ঠিক করে। নিজেকে সকালের সেই সাজের বর্তমান মলিনতার মতোই বাসি আর দৈন্যতাময় মনে হতে থাকে। কি লাভ হয়েছিল অমন যত্নে সেজে? মানুষটা তো একবার ভালো করে দেখেওনি...

'রবিন!'

নিজেকে নিখুঁত পরিপাট্যে সাজাতে ব্যস্ত তখন পুরুষ, 'কিছু বলবে?'

'তুমি ভালোবাসো আমাকে?'

'না বাসলে আজ তুমি এখানে থাকতে?' প্রশ্নের জবাবে প্রশ্ন আসে।

'সত্যি বাসো?'

'উফ! এত সন্দেহ তোমার মনে!'

'কারণ তুমি ভুলে গেছো একটা কথা।'

চোখে প্রশ্ন নিয়ে ফিরে তাকায় রবিন, আয়নায় পড়ে প্রতিবিম্ব।

সেদিকে তাকিয়ে মলিন একটু খানি হাসে ইয়াসমিন, 'আজ আমারও জন্মদিন। তুমি ভুলে গেছো!'

পাঁচ.

নিঃস্তব্ধ হয়ে থাকে হৃদয়ের নিঃসঙ্গতাও। মাসের পর মাস! না ফোন আসে, না কোনো খবর। ইয়াসমিন নিজেও চেষ্টা করে না। যতটা না অভিমানে, তার চাইতে অনেক বেশি অপমানে। একতরফা ভালোবাস্যার চাইতে অপমানজনক আর কি হতে পারে?

এতগুলো বছর সম্পর্কটা যে সে একাই ধরে রেখেছিল, রবিন বিহীন অবসরে এখন স্পষ্ট অনুভব করতে পারে। একা একা কোনো সম্পর্কের দায় বহন করা কতদিন সম্ভব? অনেকদিন তো হলো...

স্বামী কখনও প্রেমিক ছিল না, উদাসীন সে হতেই পারে। কিন্তু রবিন? সুনিপুণ হাতে ভালোবাস্যার জাল বুনে বুনে সম্পর্কটা সে একাই তৈরি করেছিল। ভীরু ইয়াসমিনকে বাধ্য করেছিল সাহসী একটা পরকীয়ার অংশীদার হতে রবিনের সেই তীব্র আবেগের বাঁধন।

কোথায় হারাল সে আবেগেরা? যদি সময়ের ধুলোর নিচে হারিয়েই যাবে, সে কি তবে ভালোবাসা ছিল? সত্যিকারের ভালোবাসা কি কালের স্রোতের সামনে পরাজিত হয়?

দোতলার জানালা দিয়ে উদ্দেশ্যহীন তাকিয়ে থাকা ইয়াসমিন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভীষণ একাকীত্বে। জাহিদের বাসায় ফিরতে কমপক্ষে রাত এগারোটা। ছেলে গেছে টিচারের বাসায়। ছুটা বুয়াটা কাজ সেরে চলে গেছে অনেকক্ষণ। এমনকি বাড়ি নেই পোষা বিড়ালটাও।...কার সাথে কথা বলবে কষ্টে নীল হয়ে যাওয়া মন?

একটু বাক্য বিনিময়ের জন্য ব্যাকুল হয় হৃদয়। প্রতিদিনই এমন অস্থির হয়ে ওঠে। এক সময় নিরুপায় হয়ে হাল ছেড়ে বসেও থাকে বিষণ্নতায় ভারী হয়ে। বুক থেকে হারিয়ে যায় ক্রমশ হৃদয় নামের কোনো কিছুর অস্তিত্বের অনুভব।

লনে বাচ্চারা খেলছে। শেষ বিকেলের মধুর হৈ চৈ। ঘরে ফেরা পাখিদের গুঞ্জনের মতো। কয়েক মুহূর্তের জন্য আলোকিত করে দেয় মনের ভেতরটা। এক্সারসাইজ করছে ভীষণ শরীর সচেতন সুমন। আড়চোখে তাকাচ্ছেও দোতলার জানালার দিকে। মাত্র একটি ইশারায় মুহূর্তে ছুটে আসবে হয়তো।

কিছু সময় তাকিয়ে সেটাই দেখে ইয়াসমিন। হেসে ফেলে আপন মনেই। আর ঠিক হচ্ছে না জেনেও চোখ ফেরায় না সুমনের শরীর থেকে। ঠিক-বেঠিকের হিসাবে এখন আর কি আসে যায়?

তবে ছেলেটার শরীর বটে একটা। স্রেফ একটা জিনস পরনে। নগ্ন উর্ধাঙ্গ বেয়ে গড়িয়ে নামছে বিন্দু বিন্দু লবণাক্ত জল। শরীর জুড়ে পেশীগুলোর ছন্দময় নড়াচড়া...

জানে না কেন, ভীষণ তৃষ্ণার্ত বোধ করে জৈবিক নারী শরীরটা। এবং তার চেয়েও বেশি তৃষ্ণার্ত বোধ করে একটি প্রেমময় আলিঙ্গনের জন্যে, ভালোবাস্যার কয়েকটি বাক্যের জন্যে, কোমল অথচ তীব্র কিছু পুরুষালী স্পর্শের জন্যে।

...একটি পুরুষ শরীরের ঘ্রাণের জন্য ভীষণ রকম অস্থির হয়ে ওঠে নারী অস্তিত্বটি।

অন্য সময় হলে হয়তো অপরাধবোধে নিজেকে ভীষণ ছোট মনে হতো ইয়াসমিনের। আজ হয় না। কেন হবে? জৈবিক চাহিদা নারীর থাকতে নেই? আর প্রেমের জন্য ব্যাকুলতা কোন নারীর হৃদয়ে না আছে! নিজের জন্য সুখ খুঁজে নেয়া অন্যায়?

রবিনই তো সেদিন বলেছিল–"নারী-পুরুষের ভালোবাসা মানে স্রেফ শারীরিক তৃপ্তি। আর কিছু নয়। যতদিন শুধু তোমাকে দিয়ে আমি তৃপ্ত ছিলাম। ততদিন তো আর কেউ আমার জীবনে ছিল না। এখন অন্য কেউ আছে...'

আর ভাবতে চায় না ইয়াসমিন। ভালোবাসা যদি কাউকে ব্যবহার করে টিস্যু পেপারের মতো ছুঁড়ে ফেলা হয়। তাহলে এই কাজ সে কেন করতে পারবে না? সুমন তো নিজে থেকে আসছে তার কাছে...

অপেক্ষা করে ইয়াসমিন–নিজেকে সাজিয়ে নিয়ে সুমনের জন্য। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা যায়; অস্থির হয় মন। নতুন পুরুষের মাদকতায় ডুবে যাবার জন্য।

মমতা বেগমের বাক্স

এক.

মোসাম্মৎ মমতা বেগম যেদিন মারা গেলেন তাঁর মৃত্যু শোকের চাইতেও সেদিন অনেক বেশি তীব্র হয়ে উঠেছিল বাক্সটি ঘিরে সন্তানদের কৌতূহল। সত্তর বছরের বৃদ্ধা এক নারী–যিনি বধূ হয়েছিলেন এগারো বছর বয়সে আর বিধবা একান্ন বছর বয়সে; যার শেষ বয়সটা কোনোক্রমে কেটেছে একটা বৃদ্ধাশ্রমে–পুরনো বাক্সটার ভেতর তিনি কি এমন সম্পদ রেখে গেছেন, তা দেখার জন্য সন্তানদের আর তর সইছিল না।

বাক্সটা অবশ্য আক্ষরিক অর্থে পুরনোই বটে। জেষ্ঠ্য পুত্রের জ্ঞান অনুযায়ী নানাবাড়ি থেকে মায়ের সাথে এসেছিল এ বস্তু। সর্বোত্তম মানের সেগুন কাঠে তৈরি কাঠামোটার আকার ছোটখাট একটা ট্রাঙ্কের মতন। শরীরের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা কারুকার্যের জৌলুস কালের ধুলোতে এখন মলিন। কোথাও কোথাও ঘুনপোকার গোপন আক্রমণের চিহ্ন আর এলোমেলো সময়ের আঁচড়। এবং ভেতরের সমস্ত রহস্যকে রহস্যই বানিয়ে রাখার জন্য ঝোলানো মান্ধাতা আমলের এক তালা।

চাবি বিহীন এই তালাটির একটা ব্যবস্থা করার জন্য বোধহয় ভেতরে ভেতরে সবাই কমবেশী উদগ্রীব হয়ে উঠছিল। কারণ প্রাথমিক কান্নাকাটির সময়টুকু পার করার পর মমতা বেগমের পুত্র কন্যাদের প্রথম আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল ওই একটি বাক্সই। বাইরে তখনও দাফন কাফনের অপেক্ষায় ছিল মমতা বেগমের মৃতদেহ এবং বৃদ্ধাশ্রমের সঙ্গীনিদের অশ্রুর আওয়াজ থেকে থেকে পাওয়া যাচ্ছিল। বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে চোখ মুছছিলেন কয়েকজন বৃদ্ধ। কে জানে, হয়তো জীবনের নিষ্ঠুরতা চিন্তা করেই। কিংবা নিজেকে কল্পনায় দেখতে পাচ্ছিলেন বেলা শেষের অন্তিম যাত্রায়।

ভোর রাতে মারা যাওয়া মমতা বেগম পড়ন্ত দুপুরেও ছিলেন শেষকৃত্যের অপেক্ষায়। অবশ্য ছেলেমেয়েদের সংবাদ দেয়া হয়েছিলো তখনই। তবে ঢাকা থেকে মাত্র একঘণ্টার পথ পাড়ি দিয়ে আসতে কেন যেন তাদের দুপুর বারোটা বেজে গেলো। এবং তারপর করা হলো রুটিন মাফিক যা যা করার ছিল। মায়ের জন্য খানিক শোক করাটাও সম্ভবত রুটিনের অর্ন্তভুক্তই। তিনটি স্বচ্ছল পুত্র আর দুটি ধনবতী কন্যার মাকে যদি শেষ বয়সটা চরম নিঃসঙ্গতায় কাটাতে হয়, তাহলে তাঁর মৃত্যু সংবাদে পুত্র-কন্যাদের রুটিন মাফিক শোকটাই হয়তো সবচাইতে বড় পাওয়া।

সে যাই হোক, শোক-টোক শেষে মমতা বেগমের সন্তানেরা সব জড় হয়েছিল ম্যানেজারের কক্ষে। মমতা বেগমের ব্যবহার্য সামান্য বস্তু কয়টি কয়েকজন বৃদ্ধাকে দিয়ে দেবার পর এই বাক্সটাই শুধু একমাত্র বাকি। যে বাক্স নিয়ে এত গল্প আছে এই

বৃদ্ধাশ্রমে, তাকে তো আর কাউকে দান করে দেয়া যায় না। তাও অদ্ভুত সব গল্প। এই বাক্সটিকে মমতা বেগম দীর্ঘ এতগুলো বছরে এক মুহূর্তের জন্যেও কখনও হাত ছাড়া করেননি। এর ব্যাপারে কেউ কোনো প্রশ্ন করলে জবাব দিতেন না। রাতে ঘুমোবার সময় তাঁর একখানা হাত রাখা থাকতো বাক্সের শরীরে। আর মাঝে মাঝে ঘরের দরজা আটকে কি সব যেন করতেন। বলতেন–"হিসাব করি।"

'তোমরা বেশি কিছু আশা কোরো না।' বড় ছেলেটি তার নিজের বয়সের হিসাবটা মেনেই মন্তব্য করেন। 'যা আছে, বেশি কিছু হওয়ার কথা নয়।'

'তা ঠিক।' একমত হয় মেঝ ছেলে। 'বড় জোর মায়ের গহনাগুলো থাকতে পারে। মেয়ে মানুষ তো, গহনাগুলোকেই যক্ষ হয়ে আগলে রেখেছিল।'

'তা হলেও অনেক!' ছোট মেয়ের মন্তব্য। 'আম্মার কি গহনা কম ছিল, ভাইয়া? পঞ্চাশ-ষাট ভরি হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। বড় আপার বিয়ের সময় যে দুটো হার বিক্রি করলো...।'

'দারুণ ছিল ওগুলো!' যোগ করে মেঝ বউ। 'রাসেলের বউকেও তো দিয়েছিল একটা। পিওর গোল্ড!'

'পিওর গোল্ড না ছাই!' নিজের ভাগটা কমে যেতে পারে ভেবে সাথে সাথে ঝাঁঝিয়ে ওঠে ছোট বউ। 'বিক্রি করে তো দশ হাজারও পাইনি। এখন আজকে যদি কিছু পাই...'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। খোলার ব্যবস্থা করা উচিত।' সায় জানায় বড় মেয়ে-জামাই। 'আম্মার দাফন কাফন স্যারতে হবে। ব্যবসাপাতি ফেলে স্যারাদিন একজায়গায় বসে থাকলে আমার চলে না।'

'সে কি আর আমারও চলে?' বলেন জেষ্ঠ্যপুত্র। 'অফিস ফেলে এখানে বসে আছি। সন্ধা হওয়ার আগে ফিরতে চাচ্ছি ঢাকায়।'

'আম্মার কবরটা কোথায় দেবেন ঠিক করলেন?'

'বাক্সের মধ্যে ভালো কিছু পাওয়া গেলে দেশের বাড়ি নিয়ে যাওয়া যেত।' বলেন বড় কন্যা। এখনও চোখ মুছছেন আঁচলে। 'আম্মার খুব শখ ছিল স্বামীর পাশে কবর হওয়ার।'

সে তো অনেক খরচের ব্যাপার। তবে হ্যাঁ, বাক্সের মধ্যে কিছু পাওয়া গেলে চেষ্টাটা করা যেতে পারে।'

বড় ভাইয়ের সিদ্ধান্তে মেয়ে-জামাই দুজন অসন্তুষ্ট হলেও মুখে প্রকাশ করে না। তালা ভাঙার লোক আনতে পাঠানো হয়েছে। ততক্ষণ সদ্ভাব বজায় রাখাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। পাঁচটা ভাগ সমান না হলে, তখন কথা বলা যাবে।

কাছাকাছি এক মাদ্রাস্যার দুটি ছেলে সুর করে কুরআন পড়ছে। আগর বাতির গন্ধে বাতাস ভারী। মসজিদের ইমাম সাহেব সময়মত জানাজাও পড়িয়ে গেলেন। এরপর মমতা বেগম অপেক্ষায় ছিলেন শুধু একটুকরো ভূমির।

পুরুষেরা জানাজা পড়ে আসতেই নাস্তা-পানি পাঠানো হয় ম্যানেজারের কক্ষে।

অতিথিদের জন্য। একটা মানুষের মৃত্যুতে জীবন তো আর থেমে থাকবে না। তবে সবাই একটু ইতস্তত করছিলো।

খুব কাঁদছিলেন তিনি। তবে এবার চোখ থেকে আঁচল সরিয়ে সরবতের গ্লাসের দিকে হাত বাড়ালেন বিদেশ ফেরত বড় কন্যা।

'তোমরাও নাও। না খেয়ে থেকে কোনো লাভ আছে?'

সবচাইতে বেশী কান্না করেছিল মেঝ বউ। তবে এবার সে নিজেই সবার হাতে হাতে নাস্তা তুলে দিল, সরবতের গ্লাস তুলে দিল। শুধু জেষ্ঠ্য পুত্রের মাইক্রোবাসটার ড্রাইভারটিকে কিছু খাওয়ানো গেল না। সে গাড়ির ভেতরেই বসেছিল এবং ম্যানেজারের পিওনকে বললো, 'এখনো আম্মাজির লাশ কবর দেয়া হয় নাই...!!!'

সেই তরুণ ড্রাইভারটি অজানা, অদেখা এক অর্থব বৃদ্ধার প্রতি মমতা প্রদর্শন করেছিলো। কিংবা একটি মৃতদেহকে দেবার চেষ্টার করছিলো তাঁর প্রাপ্য সম্মানটুকু। সে যাই হোক...চেষ্টা তো করেছিলো!

ম্যানেজারের কক্ষে তখন বাক্সটি ঘিরে কৌতূহল চরমে। মাসে মাসে টাকা পাঠিয়ে মায়ের থাকা-খাওয়া চালিয়েছে, তার ওপর আজকের এতসব খরচ–বাক্সটার ওপর সবার অধিকার আছে বৈকি। তবুও ঘরের বাইরে বসে মমতা বেগমের ছেলেমেয়েদের কথোপকথন শুনতে পেয়ে কেন যেন ভালো লাগছিল না ম্যানেজার সাহেবের। উঠোনে প্রখর রোদ, মমতা বেগমের খাটিয়াটিকে তাই রাখা হয়েছিলো বারান্দাতে। এবং ম্যানেজার সাহেব বসে ছিলেন মমতা বেগমের মাথার কাছে।

এ কাজটি সম্ভবত সন্তানদের কারও করবার কথা। একজন অর্থব বৃদ্ধা যাত্রা করছেন অন্য একটি ভুবনে, তাকে শেষ বারের মত খানিকটা সঙ্গ দেয়া। একটু অভয় যোগানো।...কে জানে, আজকালকার দিনের মানুষের কাছে হয়তো এসব হাস্যকর মনে হয়। হাস্যকর এবং যুক্তিহীন!

'কি থাকতে পারে বলো তো, আপা?' একটি পুরুষ কণ্ঠ প্রশ্ন করে। 'আম্মার গহনার হিসাব তোমার চাইতে ভালো কে জানবে?'

'আমার কিন্তু মনে হয় ক্যাশ টাকা আছে। গহনা থাকলে তো দেখতেই পেতাম। ক্যাশ বলেই কেউ বুঝতে পারিনি।'

'তা ঠিক। আচ্ছা...বাবার একটা হীরার আংটি ছিল না?'

'তা তো ছিল।' জ্যেষ্ঠ পুত্রের কণ্ঠটা চিনতে পারেন ম্যানেজার সাহেব। 'গ্রাম থেকে শহরে চলে আস্যার পর আর বাবার হাতে দেখিনি। ওই যে...রাসেল যে বছর আমেরিকা গেল পড়তে!'

'তাহলে তো আংটিটাও থাকতে পারে।'

'তবে যাই বলো আর তাই বলো। দুই ভরির কোনো সোনার চেইন পাওয়া গেলে, সেটা কিন্তু আমার। ওটায় কোনো ভাগাভাগি হবে না!'

'আহ্...মেঝ ভাবী...'

'তোমরা তো বলবেই! তোমাদের তো আর কিছু খোয়া যায়নি। যা গেছে, আমার গেছে। দু দুটো বছর তোমাদের মা থেকেছে আমার সাথে।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে। তোমার চেইন পাওয়া গেলে তুমিই নিও।'

'তবে ভাইয়া, ভাগ কিন্তু সমান সমান করবে।' ছোট কন্যার কণ্ঠটাও চেনা যায়। 'তোমরা ছেলে বলে আমাদের চাইতে বেশি নেবে না।'

'আচ্ছা, মায়ের কানে আর গলায় যে গহনা ছিল, সেসব কোথায়? পাওয়া গেছে? না... হাপিশ?'

'আরে না, না।' আবার বড় ছেলের কণ্ঠ। 'আছে আমার কাছে।'

'সেগুলো দিয়ে...'

'চুড়ি দুটা আমি নেবো...'

'আহ্ হা...'

শুনতে শুনতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন ম্যানেজার সাহেব। আহারে বেচারী! মৃত্যুর পরও গ্রীষ্মের রোদে পড়ে থাকতে হচ্ছে। কখন খোলা হবে বাক্স আর কখন নির্দিষ্ট হবে কবরের সাড়ে তিন হাত জমি। হয়তো এটাই আজকালকার নিয়ম। অর্থ না থাকলে সন্তানও আপন নয়।

ম্যানেজার সাহেব ভাবেন...ভাবতেই থাকেন।

আরও কিছু বছর পর মমতা বেগমের সন্তানদের ছেলেমেয়েরা প্রাপ্ত বয়স্ক হবে। তাদের নিজেদের ঘর হবে, সংস্যার হবে। তখন কি তারাও সেই রকমই করবে, যেমনটা বাবা মাকে করতে দেখেছে?

এসব ভাবনার তোড়ে কেন যেন ম্যানেজার সাহেবের মনে হয়, বিধাতা তাকে নিঃসন্তান রেখেই বোধহয় ভালো করেছেন।

উপসংহার

মমতা বেগমের বাক্সে কি ছিল?

মহামূল্যবান কিছু সামগ্রী। এমন কিছু স্মৃতি, যেগুলো বুকে আঁকড়ে মমতা বেগম অবশিষ্ট বছরগুলো বেঁচে ছিলেন। সেই বাক্সের সামান্য পরিসরে মমতা বেগমের আজীবনের সঞ্চয় ছিল–তাঁর পরিবার ছিল, স্বামী ছিল, সন্তানেরা ছিল।

বাবার নাম লেখা একখানা মলিন কুরআন শরীফ।

শ্বাশুড়ীর হাতের ছেঁড়া তসবি।

স্বামীর একটা পাঞ্জাবী আর নাতি রাতুলের এক পাটি জুতো।

প্রথম সন্তানটির একটা পুরনো শার্ট আর ছেলেমেয়েদের শৈশবের টুকরো টুকরো স্মৃতি। পরনের ছোট ছোট জামাকাপড়, ঝুনঝুনি কিংবা একটা ছেঁড়া মোজা।

ব্যাস্! এছাড়া আর কিছুই ছিল না।

আর কি থাকতে পারে, বৃদ্ধাশ্রমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা এক অসহায় বৃদ্ধার বাক্সে?

ইসকুল

এক.

শাহীনের দিনগুলো প্রতি সপ্তাহে মোটামুটি একই রকমভাবে পার হয়। সে– শাহীন আহসান ঊনত্রিশ বছরের এক যুবক। চার বছর মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকরির সুবাদে যার শরীর থেকে মফস্বল গন্ধটা একদমই মুছে গেছে। এক বছর মেসে থাকার পর যখন ধানমণ্ডিতে ছোটখাট ফ্ল্যাট ভাড়া করতে পেরেছিল, তারপর থেকে তার জীবনটা চলছে নিজস্ব মসৃণ গতিতে এবং ছক কাটা পথে।

শনিবার থেকে বৃহস্পতিবার নটা-পাঁচটা অফিস। কখনও বা একটু বেশি। তারপর বন্ধুদের আড্ডা এবং চির পরিচিত ক্লাব। পরিমিত মদ্যপান, ডিনার এবং কখনও সুন্দরী সঙ্গিনীকে বাড়ি নিয়ে আসা। আর শুক্রবারের সম্পূর্ণ দিনটি কাটে তার নবনীর সাথে। প্রেমিকার হাতের রান্না, দুপুরের শারীরিক ভালবাসা ও দিন শেষের বেড়ানোটুকুন মিলিয়ে দিনটা হচ্ছে সংস্যার জীবনের এক ক্ষুদ্র সংস্করণ। সপ্তাহের একমাত্র দিন– যেদিন শাহীনের শরীর থেকে অ্যালকোহলের গন্ধ পাওয়া যায় না।

তবে নবনীর ব্যাপারে শাহীনের পরিকল্পনাগুলো ক্রমশ বদলে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের প্রেমিকাকে স্ত্রীর মর্যাদা দেয়ার কোনও ইচ্ছা ইদানীং আর তার মনে অবশিষ্ট নেই। অনাথ একটি মেয়ে, সামান্য স্কুল টিচার একটি মেয়েকে বিয়ে করার মত কোনও যুক্তি থাকতে পারে? বরং এমন একটি পরিবারে বিয়ে করতে হবে, যাদের সাথে সম্পর্ক গড়ার সুবাদে ব্যাংক ব্যালান্স গড়ে উঠবে দ্রুত। এতবড় চাকরি যখন পেয়েছে, ধনী পরিবারের কোনও অপ্সরা কি আর পাওয়া যাবে না? একটি অপ্সরা, বড়সড় একটি ফ্ল্যাট, লাখ দশেকের একটি গাড়ি– ব্যস। এর বাইরে তার অন্য কোনও চাওয়া নেই। ফ্ল্যাট আর গাড়ি মন মত হলে অপ্সরাও অপ্রয়োজনীয়। ঘরে অপ্সরা থাকলেই কি আর না থাকলেই বা কি! বাইরের পৃথিবীতে তো আর অভাব নেই।

শাহীনের জীবনটা ছিল নিখুঁত ছক কাটা। জীবনে একমাত্র লক্ষ্য ছিল সবার উপরে পৌঁছানো (অবশ্য সে যোগ্যতাও তার ছিল)। এবং ক্যারিয়ারের পথে বাধা হবে বলে পারিবারিক সম্পর্কগুলোও খুব সূক্ষ্মভাবে ছিন্ন করেছে সে। বাবা বেঁচে নেই। আর মা? বড় ভাই দুটি তো আছেই মায়ের জন্য। প্রতি মাসে এক হাজার টাকা মানি অর্ডার করেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারে শাহীন। সে জানে ওই একটি হাজার টাকাই কৃষক বড় ভাইয়ের সংসারে অনেক টাকা। ভাইঝিরা সব বড় হয়েছে, এই ভাবনায় বিগত দু'বছর বাড়ির পথও মাড়ায়নি সে। পাছে বিয়েতে সহযোগিতা করতে হয়। দরিদ্র পরিবারের গ্রাম্য মেয়েগুলোর বিয়ে যেন শহুরে ছোট চাচাকে না দেখিয়ে হয়, সে

ব্যাপারে শাহীনের সচেতনতার কোনও শেষ ছিল না। আজকাল তাই বাড়ি থেকে আসা চিঠিগুলোর জবাব দেয়াও তার চোখে বাহুল্য মনে হত। এবং বাহুল্যটা সে ত্যাগ করেছে বহুদিন।

শাহীনের আহসানের জীবনটা বয়ে যাচ্ছে ঠিক তার পরিকল্পনার সুতো বাঁধা পথেই। অফিসে কলিগদের চাইতে সে ক্রমশ এগিয়ে চলছে, কারণ ক্যারিয়ারের উন্নতিতে কোনও নীতির সে ধার ধারেনি কখনও। নবনীকে ঠেলে দেয়া হচ্ছিল দূরে– খুব সাবধানে, সূক্ষ্ম বুদ্ধি ব্যবহার করে। এবং আনুশকা নামের একটি মেয়ে, ধনী বাবার একমাত্র কন্যাকে ক্রমশ টেনে নেয়া হচ্ছিল আকর্ষণের জালে। খুব ধীরে ধীরে।

সবকিছু এগোচ্ছে শাহীনের পরিকল্পনা মতই। বৈশাখের এক তপ্ত দুপুরের আগে পর্যন্ত!

দুই.

কী যে হয়েছে আজকালকার মানুষজনের! শহরে কেউ থাকলেই গ্রাম থেকে সবাই এসে তার ঘাড়ে ওঠে। আশ্চর্য ব্যাপার! এদেশের গ্রাম-গঞ্জের মানুষ যে কবে একটু সভ্য-ভব্য হবে, কবে অন্যের প্রাইভেসিকে মূল্য দিতে শিখবে,– কে জানে!

শাহীন অবশ্য জানে ড্রইংরুমে কে বসে আছে। সেই কুসুমপুর প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টার সাহেব, যাঁর হাতে শিক্ষা জীবনের সূচনা হয়েছিল। সে যাই হোক, স্যারকে ঠিকানা কে দিল? নিশ্চয়ই মা! দু'মাস আগেও তো কাকে যেন ঠিকানা দিয়ে পাঠিয়ে ছিলেন– চিকিৎস্যার জন্য। আরে বাবা, পকেটে পয়সা নেই তো ঢাকায় চিকিৎসা করানোর কী দরকার? অযথা কতগুলো টাকা বের হয়ে গেল। নাহ্। বাড়িটা মনে হয় এবার বদলাতেই হবে। আনুশকাকে বিয়ের পর গ্রামের কোনও আত্মীয় স্বজন একদমই চলবে না। মেয়েটা জানে যে শৈশবেই তার বাবা-মা মারা গেছে রোড অ্যাক্সিডেন্টে। বাবা ব্যবসায়ী ছিলেন, অর্থ সম্পদ যা রেখে গেছেন তাতে শাহীনের বেড়ে উঠতে সমস্যা হয়নি। এ কাহিনির মাঝে এখন যদি মা চলে আসে, বিরাট সমস্যা হয়ে যাবে। সোনার ডিম পাড়া হাঁসের সামনে মান ইজ্জত খোয়ানো চলবে না কিছুতেই।

আনুশকাকে মাথা থেকে সরিয়ে হেডমাস্টার স্যারের ভাবনায় মনোযোগ ফেরায়শাহীন। ইচ্ছে করেই দীর্ঘ সময় বিছানায় শুয়ে থাকে। হঠাৎ করে পাওয়া ছুটির দুপুরটাকে প্রাক্তন স্যারের সাথে কাটানোর কোনও মানে হয় না। সোহাগ ছোকরাটা আছে, সে-ই দেখবে। মনে ক্ষীণ আশাও হয়, হয়তো দেরি দেখে চলে যাবে। তবে যাই হোক না কেন, যত টাকাই লাগুক না কেন, স্যারকে এ বাড়িতে রাখার ঝামেলায় সে কিছুতেই যাচ্ছে না। বুড়ো মানুষ, চাকরি-বাকরি নেই, হয়তো আর্থিক সাহায্যের জন্যই এসেছেন। এবং সেটা হলেই ভাল। চিকিৎসা করানো বা ঢাকা দেখা টাইপের ব্যাপার হলে বিরাট মুশকিল।

দুপুরটা গড়িয়ে বিকেল হয়। দিবানিদ্রাটা সেরে চোখ খোলার পরেই বস্যার ঘরের

ফ্যানের শব্দ কানে আসে শাহীনের। স্যার তবে এখনও বসে আছেন? খানিকটা মেজাজ খারাপ নিয়েই বিছানা ছাড়ে সে। হাতমুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়। এতক্ষণ যখন বসে আছে, আল্লাহই জানে কী সমস্যা।

ছোটখাট মানুষটাকে এখন আরও ছোটখাট, সাদাসিধে দেখাচ্ছে। টকটকে গৌরবর্ণটা আছে, তবে মাথার চুলগুলো একদম শুভ্র। সর্বদা মেরুদণ্ড সোজা রেখে বসে থাকা মানুষটা বয়সের ভারে কুঁজো এখন। এই বৈশাখ মাসের গরমেও শরীরে একটা চাদর জড়ানো। পাঞ্জাবীর ছেঁড়া অংশ ঢাকার পুরানো কৌশল।

'আরে, স্যার! আপনি?' অভিনয়টা মোটামুটি ভালই হয় শাহীনের। পায়ে হাত দিয়ে প্রণামও করে ফেলে। 'আমি ভেবেছি কে না কে এসেছে! পাড়ার ছেলে-পেলেরা চাঁদার জন্য খুব বিরক্ত করে তো!'

এবার হাসি ফোটে স্যারের মুখেও। শুভেচ্ছা বিনিময় হয়, প্রাক্তন ছাত্রকে বুকে জড়িয়ে ধরা হয়। এবং তারপর...

'তোর বাসায় কদিন থাকব রে, ব্যাটা।' চশমার কাঁচ চাদরের কোনায় ঘষতে ঘষতে ঘোষণা করেন তিনি, 'বেশি না। মাস খানেক।'

রীতিমত আঁতকে ওঠে শাহীন। বলে কি এই বুড়ো? মা-স খানেক? জীবনটা যে ততদিনে গুবলেট হয়ে যাবে।

'বুড়ো হয়ে গেছি,' আবার বলেন তিনি। 'মৃত্যুর আগে ঢাকা শহরটা ভালমত ঘুরে দেখার খায়েশ আছে।'

'আপনার ছেলেরা এখন আর ঢাকায় থাকে না?'

'থাকবে না কেন? থাকে। পুত্রদের ওপর বোঝা হইতে ইচ্ছা করে না। তুই তো ছাত্র। আমার প্রিয় ছাত্র! তোর কথা আলাদা। ছাত্রদের কাছে শিক্ষকের স্থান পিতার চাইতে উঁচুতে।'

শুরু হয়ে গেল তত্ত্ব কথা! এইসব গ্রাম্য শিক্ষকদের এই হচ্ছে সমস্যা, ভাবে শাহীন। যখন তখন জ্ঞানদান শুরু করবেন। তাঁদের মান্ধাতা আমলের জ্ঞান যে একবিংশ শতাব্দীতে সম্পূর্ণ অচল, এ বোধটুকু তাঁদের নেই। এই স্যারের কথাই ধরা যাক– ইংরেজির শিক্ষক ছিলেন, কুসুমপুর গ্রামে গৌরীদাস সেনকে সবাই ইংরেজির জাহাজ বলত। তাঁর কি জানা আছে যে তাঁদের আমলের অভিধানিক ইংরেজি আজকের যুগে কতটা বদলে গেছে? সময়ের সাথে সাথে প্রাচীন সবকিছুই বদলাবে, সেটাই নিয়ম। প্রবীণ মানুষদের উচিত এ পরিবর্তনটা মেনে নিতে চেষ্টা করা।

'চোখে ঠিকমত দেখি না রে, বাপ। মনে হয় চশমা বদলাইতে হবে। একদিন একটু ডাক্তার দেখাইতে নিয়ে যাবি।'

জবাবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শাহীন। মাত্র তো শুরু, আরও না জানি কত হুকুম আসবে এরপর। না জানি কত রকমের ঝামেলা পোহাতে হবে ঘাড় থেকে এই সিন্দাবাদের ভূতকে নামাতে।

'আপনি বসেন, স্যার। আমার ফ্ল্যাটে তো বাড়তি ঘর নেই, সোহাদ না হয় ড্রইংরুমে বিছানা পেতে দেবে।'

ঘর নেই, সেটা সত্যি। বাড়তি খাটও নেই। তবে ইচ্ছা করলে স্টাডি রুমে বিছানা পাতা যায়। সেখানে তেমন কোনও আহামরি আসবাব নেই।

কিন্তু থাক্! অযথা বেশি লাই দেবার দরকার কী?

'আপনি হাত মুখ ধুয়ে ফেলুন, স্যার। আমি হরি চা-নাস্তা দিতে বলি।'

'একটা কথা বলি রে, ব্যাটা।' পিছন থেকে ডাকেন গৌরীদাস স্যার। একটু ইতস্ত ত করেন। তারপর বলেন, 'অসুবিধা না হইলে কয়টা ভাত দিতে বল্। সকাল থেকে খাওয়া হয় নাই। বয়স হয়েছে, ক্ষুধা সহ্য করতে পারি না।'

কিছুক্ষণ পর ফ্রিজে রাখা ঠাণ্ডা ভাতই যখন স্যার খুব আগ্রহ করে খাচ্ছিলেন, দৃশ্যটা অতীতে নিয়ে যায় শাহীনকে। দরিদ্র পরিবারের একটি ছেলে, যাকে টিফিন খাবার জন্য একটি টাকাও বাড়ি থেকে কখনও দেয়া হয়নি, বিকেলে স্কুল শেষ হবার সময় যে খিদেয় অস্থির হয়ে যেত– সেই ছেলেটিকে প্রত্যেকদিন এই স্যার নিজের সাথে বসিয়ে খাওয়াতেন। প্রত্যেক টিফিন পিরিয়ডে।

শৈশবের পুরনো কথা মনে করে অযথাই শাহীনের চোখ জোড়া বারবার ঝাপসা হয়ে আসে! কোনও মানে হয়?

তিন.

কী কী কমপ্রোমাইজ করতে হবে?

পরদিন অফিসে বসে ভেবে বের করার চেষ্টা করে শাহীন। স্যার যে কদিন থাকবে– অবশ্য যত দ্রুত সম্ভব ভাগিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হবে– সে কটা দিন কয়েকটা কাজ করা যাবে না একদম। আধুনিকতার এত ডোজ একসাথে উনি কখনোই নিতে পারবেন না। রাতের বেলা বাসায় মেয়েমানুষ তো বিলকুল নিষিদ্ধ! আর?... আর আনুশকা! এসব গেঁয়ো মানুষের সাথে সম্পর্ক আছে জানতে পারলে না জানি কী করবে ওই মেয়ে। অবশ্য স্যারের বাহানায় নবনীকেও দূরে রাখা যাবে কিছুদিন। তারপর একসময় সুযোগ মত আসল কথাটাও জানিয়ে দেয়া যাবে।

যাক, স্যারের থাকাটা তা হলে পুরোপুরি লসে যাচ্ছে না!– বুঝতে পেরে খুশি হয়ে ওঠে শাহীন। তবে দৈনন্দিন অ্যালকোহলের অভ্যাসটা হয়তো এবার ভুলতেই হবে।... কিন্তু কেন? তার নিজের ফ্ল্যাট, নিজের বাড়ি। সারের ভয়ে কেঁচো হয়ে থাকতে হবে কেন? তা ছাড়া, মনে হয় বুড়ো মানুষটা অতশত বুঝতেও পারবে না।

সারের প্রসঙ্গে টেলিফোন নম্বর দুটোর কথাও মনে আসে। অনেক যন্ত্রণা হয়েছে যোগাড় করতে। সারের ছেলেদের ফোন নম্বর। বুড়োর ঘটনাটা কী, একটু ভালমত জানা দরকার।

মুঠোফোনে নম্বর ডায়াল হয়। লাইন পাবার পর পরিচয় বিনিময়, শুভেচ্ছা

বিনিময়ও হয়। এবং তারপর সূচনা হয় আসল প্রসঙ্গের, দুজনের জন্যই বিরক্তিকর প্রসঙ্গের।

'দেখুন তো কী কাণ্ড!' ওপাশের পুরুষ কণ্ঠটি বলে। 'অযথা আমরা সবাই দুশ্চিন্তায় অস্থির হচ্ছি। আর তিনি গিয়ে আপনার বাসায় বসে আছেন।'

কণ্ঠটায় কোনও রকম উৎকণ্ঠার আভাস না পেলেও একমত হতে ভুল হয় না শাহীনের, 'ঠিক তো! দুশ্চিন্তা তো হবারই কথা। কিন্তু স্যারের কী হয়েছে? হঠাৎ বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন কেন?'

'চলে গেলেন কোথায়? বলুন যে, পালিয়ে গেলেন।' বিরক্তি প্রকাশ প্রায় কণ্ঠস্বরটার কম্পনে। 'আপনিই দেখুন, শাহীন সাহেব। আজকালকার পৃথিবীতে জীবনযাপন কত কষ্টকর। এর মাঝে বাড়তি একটা দায়িত্ব! তবুও বাবার দায়িত্ব আমরা দু'ভাই মিলে কোনওমতে পালন করে যাচ্ছিলাম। কিন্তু ওঁনাকে যখন বলা হলো বৃদ্ধাশ্রমে যাবার কথা, সে এক কাণ্ড! বৃদ্ধাশ্রম কি খারাপ জায়গা, বলুন? কত মানুষই তো থাকছে।'

ঠিকই তো! একমত না হয়ে পারে না শাহীন। স্যার বৃদ্ধাশ্রমে চলে গেলে নিজেও ভাল থাকবেন, ছেলেরাও ভাল থাকবে। সব সমস্যার সহজ সমাধান। তবুও কেন যেন গৌরীদাস স্যারকে কোনও একটা বৃদ্ধাশ্রমের ছায়ায় কল্পনা করে উঠতে পারে না সে। হেডমাস্টার স্যার? বৃদ্ধাশ্রমে?

'বুড়ো হলে মানুষের যে কী সব হয়ে যায়!' বলে চলে ওপাশের কণ্ঠস্বরটা। 'কী যে করব বাবাকে নিয়ে। আপনাকে তো খুব পছন্দ করেন, দেখুন বৃদ্ধাশ্রমে যাবার জন্যে আপনি রাজি করাতে পারেন কিনা।'

'ঠিক আছে, আমি দেখব। আপনি চিন্তা করবেন না।'

'আসলে হয়েছে কী, বাবার হাতে মনে হয় কিছু টাকা-পয়সা আছে। শেষ হলেই বাড়ি ফেরার জন্যে অস্থির হয়ে উঠবেন। আপনার ভাবি বলছিল যে তার একজোড়া সোনার কানের দুল...'

এবার আর শুনতে পারে না শাহীন। নিজের অজান্তেই সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। স্যারকে চোর বলা হলো? স্যারের নিজের সন্তান বলতে পারল এমন একটা বাক্য? সেই স্যারকে... যিনি অন্যকে খেতে দিয়ে নিজে উপবাসে থাকতেন?

এবার মনটাও আর্দ্র হয়ে আসে শাহীনের। থাক্, বুড়ো একটা মানুষ। কিছুদিন গেলে না হয় ভালমত বুঝিয়ে শুনিয়ে কোনও একটা বয়স্ক পুনর্বাসন কেন্দ্রে রেখে আসা যাবে। শৈশবে অনেক ভালবাসা পেয়েছে তার কাছ থেকে, বিনিময়ে এতটুকুন তো করা যেতেই পারে।

অবশ্য শাহীনের এ ভাবনাগুলো বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। বিশেষ করে রাতের বেলা বাড়ি ফিরে যখন দেখতে পায় সোহাগকে নিয়ে স্যার লঙ্কাকাণ্ড শুরু করেছেন। লঙ্কাকাণ্ড মানে সোহাগকে লেখাপড়া শেখানোর প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চলছে।

দৃশ্যটা দেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলতে বাধ্য হয় শাহীন। স্যার মনে হয় এ বাড়িতে থাকার দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা খুঁটিনাটি সহই সাজিয়ে ফেলেছেন।

চার.

মেজাজটা খারাপ লাগছে ভীষণ! একে তো তিন তিনটে সপ্তাহ হলো ঘাড়ের ওপর উটকো ঝামেলা, তার ওপর আজকের এই যন্ত্রণা। আনুশকাকে না জানি কীসব বলেছেন স্যার, বেচারী চূড়ান্ত আপসেট হয়ে আছে। সম্পর্ক ভাঙার হুমকি দিতে ছাড়েনি।

ট্যাক্সিক্যাবটা ধানমণ্ডির দিকে ছুটছিল, অথচ বাসায় ফেরার এতটুকু ইচ্ছে নেই শাহীনের।

তার কী দোষ? সে তো সবরকম চেষ্টাই করেছে। তিনটে সপ্তাহ কম ঝক্কি তো আর সহ্য করেনি। আনুশকাকে সামলানো, বাড়িতে সিগারেট না খাওয়া, কোনও মেয়েকে বেডরুমে না ঢোকানো, ক্লাব থেকে মদ খেয়ে ফেরার পর খুব সাবধানে নিজের ঘরে চলে যাওয়া যেন স্যার অ্যালকোহলের উপস্থিতি বুঝতে না পারেন– ইত্যাদি ইত্যাদি আরও কত কী। বাজার খরচের জন্য আলাদা কিছু টাকাও স্যারের হাতে তুলে দিয়েছে। নিজে তো বাড়িতে খায় সপ্তাহে মাত্র একদিন, স্যার আসবার পর সেটাও হচ্ছে না। শুক্রবারটা আজকাল আনুশকার সাথেই কাটে, দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত।

স্যারের কত অত্যাচারই তো সে মুখ বুজে সহ্য করেছে। রোজ সকালে ঘ্যানঘ্যান করেছেন মায়ের চিঠির জবাব দেয়ার জন্য। একটা সময় বিরক্ত হয়ে লিখে দিয়েছে চিঠি।

তার ওপর গত শুক্রবার ঘটিয়েছেন আরেক কাণ্ড। সিগারেট কিনে বাসায় ফিরে তো শাহীন একদম বিস্মিত। নবনী এসে বসে আছে। শুধু যে এসেছে তা নয়, হইচই করে বিরিয়ানী রান্না করছে। নিশ্চয়ই বাসায় কখনও ফোন করে স্যারের সাথে পরিচয় হয়েছিল। সুযোগ বুঝে বুড়ো তাকে ডেকে এনেছে বাসায়। খাতির করে ফেলেছে। রান্নাঘরে সে কী গল্প দুজনের! কানে কানে আবার কী সব ষড়যন্ত্রও হয়েছে।... অসহ্য!

দুজনেই অসহ্য। নবনী যেমন সব বুঝেও চুইংগামের মত পিছনে লেগে আছে, স্যারও তেমনি। বুড়োটা হলো শিরীষ গাছের আঠা। অযথা যন্ত্রণা করছে। এমন মানুষের জন্য বৃদ্ধাশ্রমই সেরা স্থান। সাধে কি আর ছেলেমেয়েরা ত্যাগ করেছে তাকে?

আজ স্যারের ছেলেদেরকে ফোন করার চেষ্টা করেছিল শাহীন। দুটো নাম্বারই বন্ধ। সম্ভবত বাবাকে এড়াতে দুজনই নম্বর বদলে ফেলেছে। বদলাবেই তো, যদি এমন যন্ত্রণাদায়ক বাবা হয়!

নিজের গালে কষে একটা থাপ্পড় কষাতে ইচ্ছে হয় তার। কী দরকার ছিল এতটা লাই দেবার? আসলে পরদিনই একটা বাহানা করে ভাগিয়ে দেয়া উচিত ছিল। মানুষ নিজের পায়ে কুড়াল মারে, আর সে কুড়ালে গিয়ে মাথা ঠুকেছে। কোনও মানে হয়?

আনুশকার মত মেয়ে জীবনে আর পাবে সে? সবচাইতে বড় কথা, মেয়েটা সত্যি সত্যি ভালবাসে তাকে। ঠিক আছে, দেখতে না হয় একটু খারাপ। কালো, হাইট কম, নাকটা বেশ মোটা, চেহারাটাও খুব ভাল নয়। কিন্তু তাতে কী? বিউটি পার্লারের রূপচর্চা আর আধুনিক ফ্যাশনের কারণে ওসব আর চোখেও পড়ে না। সোনার ডিম পাড়া হাঁসের চেহারা দিয়ে কী আসে যায়? তা ছাড়া আনুশকার ফিগ্যারটা বেশ ভাল। সর্বদা ফ্যাশনেবল আর ঝাঁ চকচকে চেহারা। জিন্‌সের প্যান্ট আর টপসে তো দুর্দান্ত লাগে। দশজনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার মত মেয়ে। নবনীর মত টেনে চুল বাঁধা, আটপৌরে শাড়ি পরা, নাকের ডগায় চশমা বসানো স্কুল মাস্টার নয়। নবনীকে বিয়ে করলে বন্ধু মহলে মান-ইজ্জত আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না।

আল্লাহই জানে বুড়ো কী বলেছে আনুশকাকে! ভাবতে ভাবতেই বাড়ি চলে আসে। স্যারের কাছ থেকেও কিছু জানা যাবে না হয়তো, তবে কঠিন কিছু কথা শোনাতেই হবে আজ। যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়।

গৌরীদাস স্যারই দরজা খোলেন। পরনে সাদা লুঙ্গি। গায়ে জড়ানো সেদিনের সেই চাদরটা।

'কী রে, ব্যাটা। এত দেরি কেন? খেয়ে এসেছিস, না ভাত দিবো টেবিলে?'

'ভাত খাব,' নিজের অজান্তেই জবাব দিয়ে ফেলে শাহীন। সাথে যোগ করে, 'আপনাকে দিতে হবে না। সোহাগই পারবে।'

'অসুবিধা নাই কুনো।' ভাল মত দেখতে পাবার জন্য চশমার কাঁচ ঘষতে ঘষতে জবাব দেন স্যার। বুঝতে পারেন না যে হাজার ঘষাঘষি করলেও এই পুরনো চশমায় আর স্পষ্ট দেখা যাবে না। 'সোহাগের শরীরটা ভাল না। জ্বর। কালকে ডাক্তার দেখাইতে হবে।'

'ঢঙ! কাজের ছেলের জন্য ডাক্তার ডাকতে হবে! মেজাজটা আবার চড়ে যায় শাহীনের। ফ্যান ছেড়ে ড্রইং রুমেই বসে পড়ে সে।

'আপনার সাথে আমার কিছু কথা ছিল, স্যার।'

হাসেন তিনি। 'বলে ফেল্ রে, বাবা। শিক্ষকের সাথে কথা বলতে অনুমতি লাগে না।'

উফ! আবার তত্ত্বকথা! তবুও অনেক কষ্টে মেজাজটা ঠাণ্ডা রাখে শাহীন।

'আমার বান্ধবীকে আপনি কী বলেছেন, স্যার? তাকে অপমান কেন করেছেন?'

'নবনী? ওকে কেন অপমান করতে যাব? আজকেও তো দেখা করতে আসছিল।'

'নবনী নয়, আনুশকা।'

এবার যেন ভাবনায় পড়েন তিনি। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকেন ছাত্রের শীতল চেহারার দিকে।

'একটা মেয়ে তো আসছিল। নবনী তখন ছিল ঘরে। আমি ভাবলাম বেচারী আবার তোরে ভুল বুঝে নাকি, তাই আনুশকা মেয়েটারে ঢুকতে দিলাম না। যেই রকম কাপড়

পইরে আসছিল, নবনী মা রাগ করতেই পারত।'

সশব্দে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শাহীন। 'নবনী রাগ করবে কি না সেটা আমার ব্যক্তিগত বিষয়, স্যার। এ ব্যাপারে আপনার কথা বলার দরকারটা কী? আর আপনাকে কে বলল যে নবনীর সাথে আমার কোনও বিশেষ সম্পর্ক আছে? আনুশকাকে অপমান করার অধিকার আপনাকে কে দিল?'

'না, মানে... নবনী...'

'প্লিজ, স্যার!' শান্ত স্বরেই উচ্চারণ করে শাহীন। 'আমার বাসায় আছেন যখন, একটু নিয়ম মেনে থাকেন। খাওয়া দাওয়া করেন, টিভি দেখেন, ঢাকা শহর ঘোরেন। কিন্তু দয়া করে আমার ব্যক্তিগত বিষয়ে নাক গলাবেন না। প্লিজ!'

স্যার সবই শোনেন। ছাত্রের মতই শান্ত ভঙ্গিতে। তারপর হাসেন আপন মনে, মাথা নাড়েন এপাশ ওপাশ।

'তুই বলতেই পারিস। তুই তো আমার আপনার লোক।... এমুন আর হবে না, ব্যাটা! নিশ্চিন্ত থাক।... হাত মুখ ধুইয়ে খাইতে আয় রে, বাপ। আমি খাবার দিচ্ছি।'

যত অনিচ্ছা থাকুক, খাবার টেবিলে আসতেই হয় শাহীনকে। দিন ভরের ক্লান্তি খিদে হয়ে পাকস্থলীতে জানান দিচ্ছে। অবশ্য আয়োজন খুব সামান্য। মোটা চালের ভাত, ডাল, আলু ভর্তা। ছোট্ট বাটিতে খানিকটা ঘি, পিরিচে লাল করে ভাজা শুকনা মরিচ।

গরম ভাতের গন্ধ কীভাবে যেন শৈশবে ফিরিয়ে নেয় শাহীনকে। সন্ধ্যা হতেই মায়ের আঁচল ঘেঁষে বসত তিন ভাই। হ্যারিকেনের আলোয় তিনজনকে একসাথে মুখে তুলে খাওয়াতেন মা। আয়োজন খুব সামান্যই থাকত, এক পদের বেশি দু'পদ কখনও নয়। শুধু আচারটা পাওয়া যেত প্রতিদিন, মায়ের হাতের আচার!

বহুদিন পর মুখে তোলা মোটা চালের ভাত শাহীনকে অহেতুকই আবেগপ্রবণ করে তোলে। কেন যেন মনে হয় এই ভাতের সাথে তার আজন্মের নাড়ির টান!

পাঁচ.

অন্যসময়ের মত রাতের আবেগ ভোরের আলোয় পরদিন আর পালিয়ে যায় না। বরং কেন যেন গাঢ় হয়। বিশেষ করে সকালে যখন স্যারকে দেখে– সোফায় হেলান দিয়ে বসে ঘুমোচ্ছেন, ওঁনার বিছানায় সোহাগ ঘুমিয়ে আছে। ছেলেটার কপালে পানি পট্টি দেয়া। স্যার সম্ভবত রাত জেগে ওর দেখাশোনা করেছেন।

খুব ইচ্ছে হয় স্যারকে ডেকে তুলতে, ক্ষমা চাইতে। তবুও কীভাবে যেন শহুরে ইগো সন্তর্পণে টেনে নিয়ে আসে অফিসে। তবে যত যাই হোক, মনটাকে বশ মানানো যায় না। ঘুরেফিরে শুধু বাবার চেহারাটা চোখে ভাসে, মায়ের মুখটা মনকে আর্দ্র করে। ভাই, ভাবী, ভাইপো-ভাইঝিগুলো– আহারে! না জানি কত কষ্টে দিন কাটে ওদের। আর এখানে তার বিলাসিতার শেষ নেই।

মন টেকে না, অগত্যা অফিস থেকে জলদিই বের হয়ে যায় শাহীন। এমনিতেও আজ শুক্রবার ওভারটাইমই করছিল সে। কী মনে করে বড় এক চক্ষু বিশেষজ্ঞের সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে। স্যারের চোখটার ভালমত চেক আপ করাতে হবে, ছানি-টানি পড়ল কিনা! খুঁজে পেতে ভাল একটা পাঞ্জাবীও কিনে ফেলে স্যারের জন্য। আর গোটা দুয়েক লুঙ্গি। একজোড়া স্যান্ডেল। জীবনে প্রথমবার সোহাগের জন্যও নতুন শার্ট-প্যান্ট কেনে। এবং সবশেষে অনেক ভেবেচিন্তে নবনীর জন্য একটা শাড়ি। বেশ দামী একটা শাড়ি। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও নবনীকে যা কখনও দেয়া হয়নি।

মার্কেটে ঘোরাঘুরির সময়ে পকেটে রাখা মোবাইল ফোনটা শব্দহীন কম্পনে জানান দিচ্ছিল কারও ডাক। যদিও দীর্ঘসময় সে ডাককে অবহেলা করেছিল শাহীন। আনুশকার ফোন কল ভেবে। কারণ অফিস থেকে বের হয়েই আনুশকার সাথে দেখা হয়েছিল আজ, ওদের গাড়ি যখন সিগনালে আটকে ছিল। আনুশকা এবং একটি ছেলে ঘনিষ্ঠ ভঙ্গিতে বসে আছে... শাহীনকে সত্যিকারের ভালবাস্যার নমুনা!

যদিও মুঠোফোনের ডাকটি আনুশকার ছিল না। নবনীর ছিল। মেয়েটা শাহীনকে খুব বড় একটা দুঃসংবাদ দেবার অপেক্ষা করছিল।

গৌরীদাস স্যারের মৃত্যুশয্যার সংবাদ!

ছয়.

'কান্দিস ক্যান রে, ব্যাটা? পুরুষ মানুষের কাঁদতে নাই।'

জবাবে আরও দুফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে নামে শাহীনের গাল বেয়ে। নবনীও কেবিনের বাইরে দাঁড়িয়ে অনবরত কেঁদেই যাচ্ছে।

'আহ্ হা, আবার কান্দিস!... কান্দিস না। আমি তো তোর কথায় কিছু মনে করি নাই। আমার বুকে ব্যথার সাথে তোর কুনো সম্পর্ক নাই।'

এবারও একটা বাক্য উচ্চারণ করতে পারে না শাহীন। আজীবনের শিক্ষক মানুষটি জীবনের শেষ পাঠদানের পরপরই এভাবে চলে যাবেন? কেন? জগতের নিয়মগুলো এত নিষ্ঠুর কেন?

'মৃত্যুর পর আমারে ইলেকট্রিক চুলাতেই দিস রে, বাপ। আর না হয় মাটি চাপা দিয়ে দিস। দাহ করার অনেক খরচ।'

'এগুলো কী বলেন, স্যার? দাহ করার

প্রশ্ন কীভাবে এল? আপনি নিজের পায়ে হেঁটে আমার সাথে কুসুমপুর যাবেন। আমরা দুজনে একসাথে যাব।'

'আমার যাওয়া হবে না, ব্যাটা। কিন্তু তুই নিশ্চয়ই যাবি। আহ্ হা... তোর মা স্যারাদিন পথের দিকে তাকায় থাকে... তোর অপেক্ষায় তাকায় থাকে।'

শাহীনের আর কিছু বলা হয় না। একটা সময় আসে, যখন আর কিছু বলাও যায় না। মানুষের হাতে কি-ই বা আছে। শুধু অপেক্ষা করা ছাড়া?

পরিণামের অপেক্ষা!

এবং সেটাই করে শাহীন। নবনীর হাতে হাত রেখে।

ভোর সাড়ে পাঁচটায় মারা গেলেন গৌরীদাস সেন স্যার। কুসুমপুর নামক প্রত্যন্ত এক গ্রামের ইংরেজির জাহাজ।

এবং সকাল হতেই সারের মরদেহ নিয়ে বাড়ির পথে রওনা হলো শাহীন আহসান নামের ছেলেটি। কুসুমপুরের পথে রওনা হলো, নবনী নামের ভীষণ রকম সাধারণ মেয়েটির হাত ধরে।

স্যারকে পূর্ণ মর্যাদায় কুসুমপুর গ্রামের স্থানীয় শশ্মানেই দাহ করা হয়েছিল। তাঁর ছেলেদেরকে কোনও সংবাদ দেয়া যায়নি। তবে শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর মুখাগ্নি শাহীন নামের ছেলেটিই করেছিল।

জনৈক জিল্লু হোসেন

এক.

সকাল দশটা থেকে শুরু, এখন বাজে বিকাল তিনটা। তুচ্ছ একটা ব্যাপার নিয়ে হৈ চৈ করেই যাচ্ছে সবাই। সরকারী অফিসের এই হলো প্রধান সমস্যা। একটা কিছু পেলেই হলো, কাজ-কর্ম ফাঁকি দিতে বেশিরভাগ মানুষ তখন সেটা নিয়েই মাতামাতি করবে। অথচ অফিস আওয়ারের বাকি মাত্র একটা ঘণ্টা...

চিন্তা করে মুখের ভেতরটা তেতো লাগতে শুরু করে আফজাল সাহেবের। এর অর্থ মেজাজ চড়ে গেছে। অবশ্য ঘটনা যা ঘটেছে, সেটাকে বোধহয় তুচ্ছ বলা ঠিক হবে না। এ অফিসে কালে ভদ্রে এরকম 'মজার' কোনও ঘটনা ঘটে। এতই মজার ঘটনা যে আগামী এক বছর অফিস ক্যান্টিনে এটা ছাড়া অন্য কোনও প্রসঙ্গও প্রাধান্য পাবে না। লোকটার ঠিকুজি-কোষ্ঠী টেনে বের করা হবে, পরিবার-পরিজন নিয়ে নানান পদের গল্প হবে। যার ৯০ ভাগ গল্পই হবে মিথ্যা। এক পর্যায়ে তার স্ত্রীকেও টেনে আনা হবে। কুৎসিত থেকে কুৎসিততম আলাপ-আলোচনা হবে এমন একটা মেয়েকে নিয়ে। যাকে কেউ কখনও চোখে পর্যন্ত দেখেনি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন আফজাল সাহেব। জিল্লুর যে মাথা খারাপ, এটা সবাই জানে। অফিসের প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টের প্রতিটি মানুষ জানে। কিন্তু তবুও; আজ যা হলো তা বাড়াবাড়ির চূড়ান্ত। কোনও ডিপার্টমেন্টের এক চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে মারধর করেছে জিল্লুরা মারধর মানে মোটামুটি রক্তারক্তি কাণ্ড। তবে এখানে যে সব দোষ জিল্লুর তেমনটাও মনে হচ্ছে না তাঁর। মাথা খারাপ মানুষ, বেচারাকে সবাই খেপিয়ে দেয়ার তালে থাকে। খেপিয়ে মজা পায়। সেরকমই কিছু একটা হয়েছে সম্ভবত।

আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন তিনি। আজ মনে হচ্ছে অফিসের কাজকর্ম আর এগোবে না। তবে জিল্লুর একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। প্রয়োজনে না হয় ঘণ্টা দুয়েক দেরি হবে বাড়ি ফিরতে। কারণ, এভাবে চলতে থাকলে একদিন গণপিটুনি খাবে বেচারা। নেহাত সরকারী চাকরি বলে এখনও দুটো রোজগ্যার করে খাচ্ছে। না হলে কবে বরখাস্ত হয়ে যেত।

ঢাকায় নাকি জিল্লুর বড় দু'ভাই আর বোন থাকে। সবচাইতে বড় ভাইকে খবর দেয়া হয়েছে, হয়তো চলে আসবেন ঘণ্টা খানেকের মাঝে। ভদ্রলোকের হাতে জিল্লুর দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে আজকের ঘটনার তাৎপর্যটা একটু ব্যাখ্যা করতে হবে। আপনজনেরা মানুষটাকে সামলে না রাখলে আর কে রাখবে? একটা মেন্টাল হসপিটালের ঠিকানাও দিয়ে দেবেন ভেবেছেন। পরিচিত হাসপাতাল তাঁর, যথেষ্ট

কনসেশন পাওয়া যাবে। চিকিৎস্যার ব্যবস্থাও বেশ ভাল।

ভাবতে ভাবতেই বেল টেপেন তিনি। পানি খাওয়ার দরকার, কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়ার পর প্রবল তৃষ্ণা বোধ করেন তিনি। জিল্লুর তাঁর ডিপার্টমেন্টের লোক নয়। যেচে পড়ে দায়িত্ব নেয়ার কোন মানে হয় না। অফিসের লোকদের পিটুনির হাত থেকে যে রক্ষা করেছেন, সেটাই অনেক বেশি। তবুও কেন যেন লোকটার জন্য প্রবল মমতা বোধ হচ্ছে।

অন্যদিন হলে মুহূর্তে দৌড়ে আসে, কিন্তু আজ বেশ সময় নেয় পিয়ন রমিজ। এসেই দাঁত বের করে হাসে, 'মাথায় পানি দিতেছে স্যার!'

অনেক কষ্টে চট্ করে উঠে যাওয়া রাগটা নিয়ন্ত্রণ করেন আফজাল সাহেব।

'পানি দিচ্ছে মানে? কে মাথায় ঠিক পানি দিচ্ছে?'

'পাগলা সারে মাথায় পানি দিতেছে। বালতি একখান লইয়া তার মইধ্যে মাথা চুবানি...'

'জিল্লু? তাকে ডেকে নিয়ে আসো, যাও।'

রমিজ মনে হলো ব্যথিত হলো একটু। 'সবাই তো দেখতেছে, স্যার! একটু পরে ডাকি?'

জবাবে অবশ্য রাম ধমক দেন আফজাল সাহেব। এগুলো কোন দেশী বদমায়েসী? একটা মানুষ কি মাথায় পানিও দিতে পারবে না? মানুষটা মানসিক ভারসাম্যহীন বলে তার সামান্য একটা কর্মকাণ্ডও সকলে জটলা পাকিয়ে দেখতে হবে?

দরজা ঠেলে ঢোকে জিল্লুর। বেশ ভদ্রভাবেই। 'আস্সালামু ওয়ালাইকম, স্যার!'

লোকটাকে বসতে বলে আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন আফজাল সাহেব। সবাই জটলা পাকিয়ে মাথায় পানি দেবার দৃশ্য দেখার রহস্যটা এখন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

বয়স চল্লিশের মত হবে জিল্লুর। কিংবা আরও কম। পরনে রঙচঙে হাওয়াই শার্ট। গলায়-হাতে মোটা মোটা সোনালি চেইন। মাথায় টাক, মুখে গোঁফ। আর সেই টাকের অবশিষ্ট ক'গাছি চুল, গোঁফ, শার্ট বেয়ে গড়াচ্ছে পানি। গড়িয়ে পড়া পানিতে প্যান্ট আর জুতা পর্যন্ত ভিজে চপচপে।

শিশুদের মত সরল ভঙ্গিতে হাসে মানুষটা। 'এমন মাইর দিছি, স্যার! জটিল মাইর!'

'কিন্তু কাজটা ঠিক কী হলো, জিল্লু?' নরম স্বরে বলেন আফজাল সাহেব। 'সমস্যার সমাধান কি মারামারি করে হয়?'

'না দিয়ে কী করব? মিথ্যা বলে তো!' বিভ্রান্ত মনে হয় জিল্লুকে। হড়বড় করে আরও একগাদা কথা বলে যায় নিজের স্বপক্ষে।

'...মতিন আমার কাছ থেকে বিশ হাজার টাকা নিছে। চাইর মাস আগে নিছে। টাকা চাই, দেয় না। স্যারেরে বললাম। স্যার বলে, "তুমি পাগল-ছাগল মানুষ। টাকা দিয়ে কী করবা? চুপ থাকো!" আমি তখন বললাম, "টাকা না থাকলে খাবো

কী?"...তারপর স্যারে গালি দিল...'

এ পর্যায়ে বাধা দেন আফজাল সাহেব, 'টাকা নেই মানে? মাসের মাত্র পাঁচ তারিখ। বেতন কী করেছ?'

'ওইটা তো শফিক সাহেব ধার নিছে। একমাস পরে দিয়ে দিবে। উঁনার নাকি মেয়ের বিয়ে...'

মেয়ের বিয়ে!! শফিক সাহেবের কোন মেয়েই নেই, তার আবার বিয়ে! মাথা খারাপ মানুষটাকে যে যেভাবে পারছে লুটে-পুটে খাচ্ছে। প্রচণ্ড মেজাজ খারাপে মুখের ভেতরটা বিস্বাদ লাগতে শুরু করে আফজাল সাহেবের।

'কিছু খাবে, জিল্লু?' আগের চাইতেও নরম স্বরে প্রশ্ন করেন তিনি। 'তোমার তো মনে হয় খাওয়া হয়নি।'

মাথা চুলকায় জিল্লু। 'মনে হয় খাব, স্যার। ভাত খাব। পেটে বেজায় খিদে। গতকাইল সকালের পর কিছু খাই নাই। পকেটে টাকা ছিল না। খিদেতে মাথা গরম ছিল বইলেই তো...'

রমিজকে ডেকে জিল্লুর জন্য ভাত আনতে বলেন আফজাল সাহেব।

'মুরগী আনতে বলেন, স্যার। মাছ বাছতে পারি না। আর কাঁচা মরিচও আনতে বলবেন। সাথে লেবু আর লবণ। আর পেপসির একটা বোতল। পানি খাইতে ভাল লাগে না।'

রমিজ চলে যায় বেজার মুখে। বড় সাহেবের আদিখ্যেতায় সে রীতিমত বিরক্ত। রমিজের চেহারা দেখে বোধহয় বিরক্ত হয় জিল্লুও।

বলে, 'দুষ্টু লোক, স্যার। বেজায় দুষ্টু লোক। আমার স্ত্রীর মত দুষ্টু।'

'তুমি বিয়ে করেছ, জিল্লু?'

'দুই বার করেছিলাম, স্যার। প্রথম স্ত্রীর নাম রোখসানা। তার সাথে তিন বছর ঘর করেছিলাম। আমার মাথা তো তখন খারাপ ছিল না...'

'দ্বিতীয় বিয়ে কেন করলে?'

'কী করব, স্যার? প্রথম স্ত্রী ভাইগে গেল। আমার আপন চাচাতো ভাইয়ের সাথে ভাইগে গেল। বলে,"টাক মাথার লোকের সাথে ঘর করি না।" ভীষণ বজ্জাত মেয়ে!'

'তারপর আরেকবার বিয়ে করলে?'

'না না, তারপর না। রোখসানার জন্যে দশ বছর অপেক্ষা করেছি আমি। সপ্তাহে একদিন ওর বাসায়ও যাইতাম। কত রিকোয়েস্ট যে করছি! এরপর ভাইয়েরা ধইরে আরেকটা বিয়ে দিল। মেয়ের বাড়ির কেউ জানত না যে আমার মাথা খারাপ। জানল যখন, এক মাস পরে মেয়েরে ছাড়ায় নিয়ে গেল।'

মন খারাপ ভাবটা আরও প্রবল হয় আফজাল সাহেবের। জিল্লুর পাগলামির কারণ তা হলে ওর প্রথম স্ত্রী? মেয়েটাকে বোধহয় সাংঘাতিক ভালবাসত...

একা একা তখনও বকবক করেই যাচ্ছে জিল্লু।

বড় ভাল মেয়ে ছিল, স্যার। যেদিন চলে যাবে, সেদিন আমার সাথে কী ঝগড়া! তবুও যাওয়ার আগে রান্নাবান্না করে ফ্রিজে রেখে গেল; আমার খাওয়ার যেন কোন কষ্ট না হয়। গোসল করল, সুটকেস গোছাইলো। তারপর চইলে গেল। এইটাও বইলে গেল যে সুমনের সাথে যাচ্ছে। কক্সবাজার। আমার বাসায় সাবলেট থাকত সুমন।'

বলতে বলতে শার্টের হাতায় চোখ মোছে মানুষটা। 'বড় ভাল মেয়ে ছিল, স্যার। শুনেছি, দুটো ছেলেও হয়েছে। স্যার, আপনি কি তারে একবার ফোন করবেন? করেন না স্যার! তারে বলবেন ফিরে আসতে। আপনের মত মানুষ বললে সে নিশ্চয়ই আসবে। আমি জানি, আসবে সে। স্যার, একবার কি তারে ফোন করবেন আপনি?'

দু'চোখে একরাশ প্রত্যাশার দীপ্তি নিয়ে আফজাল সাহেবের দিকে তাকিয়ে থাকে জিল্লু হোসেন!

দুই.

'ঠিকানাটা একটা মেন্টাল হাসপাতালের। মিরপুরে। আপনি দয়া করে একটু খোঁজ করে দেখুন। এভাবে তো আর চলতে দেয়া যায় না।' সামনে বসা মানুষটা বেশ আগ্রহ করেই নেন কাগজটা। পঞ্চাশের মতন হবে বয়স, মুখের চাপ দাড়িতে পাক ধরেছে অল্প অল্প। তার পাশেই বসা জিল্লু; ভাত খাচ্ছে। চেয়ারে দু'পা তুলে বসে খুব আরাম করে খাচ্ছে।

সেদিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে আবার মোসাদ্দেক হোসেন নামের মানুষটার দিকে ফেরেন আফজাল সাহেব। লোকটা জিল্লুর বড় ভাই।

'ক্লিনিকটার একজন ডাক্তার আমার বান্ধবী। ওখানে গিয়ে মালিহা সারোয়ারকে খোঁজ করবেন। আমার কথা বললেই ভর্তি করে নেবে। বেশ ভাল অংকের কনসেশনও পাবেন। আপনারা ভাই-বোনেরা মিলে এবার জিল্লুর একটা ব্যবস্থা করেন।'

'অনেক চিকিৎসা করিয়েছি, আফজাল সাহেব,' বলেন সামনে বসা মানুষটা। 'ডাক্তার থেকে শুরু করে হুজুর–কবিরাজ পর্যন্ত। কোন ফায়দা হয় না। পাগলাগ্যারদে রাখাই বোধহয় শেষ ভরসা।'

'পাগলাগ্যারদ কেন হতে যাবে? জায়গাটা মানসিক রোগ চিকিৎস্যার একটা ক্লিনিক। যতদিন সুস্থ না হয়, সেখানে থাকতে হবে। তা ছাড়া, আমার মনে হয় জিল্লুর সমস্যাটা এমন গুরুতর কিছু নয়। অল্পদিন চিকিৎস্যার পরেই দেখবেন সুস্থ হয়ে উঠবে।'

'তাই যেন হয়। এবার আল্লাহ ভরসা!' মুখে বলেন বটে মোসাদ্দেক হোসেন, ভেতরে ভেতরে পৌঁছে যান বিরক্তিকর চরম সীমায়। এ কী মুসিবত হলো? আফজাল নামের লোকটাকে তো দেখে মনে হচ্ছে আসমান থেকে নামা ফেরেশতা। আরে ব্যাটা, এতই যখন ফেরেশতাগিরি করার শখ তো নিজের বাসায় নিয়ে যা না!

হুম-হাম শব্দে ভাত খাচ্ছে পাশে বসা জিল্লু। স্ত্রী একে দেখলে কী পরিমাণ চেঁচামেচি করবে, সেটাই ভাবতে শুরু করেন মনে মনে। নাহ্, বাসায় নেয়া যাবে না। ক্লিনিকেই মনে হচ্ছে ভর্তি করাতে হবে। কিন্তু টাকা? অতগুলো টাকা আসবে কোত্থেকে?

ব্যাপারটা মনে হয় বুঝতে পারেন আফজাল নামের লোকটা। শান্ত স্বরে বলেন, 'জিল্লুর মানিব্যাগে হাজার বিশেক টাকা আছে। ভেতরের পকেটে, যেখানে আপনার ফোন নাম্বার আছে। ওর নিজেরই টাকা। আমার মনে হয় প্রাথমিক খরচটা সেখান থেকেই হয়ে যাবে। প্রয়োজনে না হয় প্রভিডেন্ট-ফান্ড থেকে লোন তোলার ব্যবস্থাও করা হবে। জিল্লুর সুস্থ হওয়াটাই এখন প্রধান বিষয়।'

এবার একটু নিশ্চিত মনে হয় মোসাদ্দেক হোসেনকে। অন্তত আফজাল সাহেবের সেরকমই মনে হয়। অবশ্য সেটাই স্বাভাবিক। আজকালকার যুগে এত অর্থ কজনেরই বা থাকে যে পাগল আত্মীয় পরিজনের চিকিৎসা করাবেন!

'আপনি চিন্তা করবেন না, আফজাল সাহেব। ওর বড় ভাই আমি, রাস্তায় তো আর ফেলে দেব না। আজই ধরে নিয়ে ক্লিনিকে ভর্তি করাচ্ছ।'

'প্লিজ, তাই করুন।'

'প্রথমে যেতে চাইবে না। রাগ্যারাগি করবে। প্রয়োজনে দু ভাই মিলে বেঁধে নিয়ে যাব। ক্লিনিকের অ্যাম্বুলেন্স আছে না?'

'তা আছে। দেখুন, আপনারা যা ভাল মনে করেন।'

আফজাল সাহেবকে আশ্বস্ত করে বিদায় নিয়ে চলে যান মোসাদ্দেক হোসেন। পেছন পেছন রওনা হয় জিল্লুও; পেপসির বোতল হাতে। যাওয়ার সময় দরজা থেকে শেষ একবার ফিরে তাকায়। মুখটা করুণ করে বলে, 'স্যার, আপনার মনে থাকবে তো? নাম্বারটা মনে আছে? রোখসানাকে একবার ফোন কইরেন, স্যার। বলবেন, জিল্লুর বড় কষ্ট! সে যেন সংবাদ পাওয়া মাত্র চলে আসে।'

মাথা নেড়ে আশ্বাস দেন আফজাল সাহেব। মিথ্যা আশ্বাস!

তিন.

দুদিন পর। বেলা দশটা।

ফোনটা ক্রমাগত বাজছে। একসময় বিরক্ত হয়েই ফোন ধরেন তিনি। মনটা পুরোপুরি সামনের ফাইলে। শুধু অসহ্য আওয়াজ বন্ধ করার জন্য ফোনটা ধরা।

'হ্যালো!'

'আফজাল ভাই?'

'হ্যালো... কে?'

'আমি মালিহা, আফজাল ভাই।'

একটু সচেতন হয়ে ওঠেন তিনি। মনে হয় জিল্লুর কোন খবর। 'হ্যাঁ, মালিহা। কী

ব্যাপার, আছ কেমন?'

'খুব বিপদে আছি,' ওপাশে বিভ্রান্ত কণ্ঠ শোনা যায়। 'এটা কেমন ঝামেলায় পড়লাম, কে জানে!'

'আহ্হা! ব্যাপারটা কী, আগে সেটা তো বলো।'

'বলছি শুনুন। মন দিয়ে শুনুন।...পরশু সন্ধ্যার দিকে আমাদের ক্লিনিকে এক লোক এসেছে পেশেন্ট নিয়ে। এসে আমার খোঁজ করেছে। আমার তখন ডিউটি অফ্। লোকটা কী করেছে শুনুন। পেশেন্টকে ভর্তি না করিয়ে রিসিপশনে বসিয়ে রেখে গেছে। রিসিপশনে বলে গেছে যে আমার পেশেন্ট। এর সমস্ত দায়-দায়িত্ব নাকি আমার। গতকাল ছুটি ছিল আমার, আজ অফিসে এসে আমি তো হতভম্ব।'

'বলো কী? তারপর?' তখনও বুঝতে পারেন না আফজাল সাহেব।

'তারপর আর কী, সব ঝামেলা আমার কাঁধে। লোকটার অসুখটা যেমনই হোক না কেন, প্রিয়জনের হৃদয়হীনতায় একদম ভেঙে পড়েছে বেচারা। আজ অনেক কষ্টে তার কাছ থেকে আপনার নামটা বের করতে পেরেছি। বলল, আপনি নাকি পাঠিয়েছেন।'

'সে কী! লোকটার নাম কি জিল্লু হোসেন?'

'হ্যাঁ, জিল্লু হোসেন।'

'তুমি ওকে ভর্তি করিয়ে নাও, মালিহা। কিন্তু ওর সাথে মোসাদ্দেক হোসেন নামে এক লোক থাকার কথা। সে-ই কি তবে ওকে ফেলে চলে গেল?'

'সম্ভবত সে-ই। জিল্লু সাহেব বলছেন যে তার ভাই বলেছেন ক্লিনিকে অপেক্ষা করতে। তিনি নাকি হোটেল থেকে ভাত খেয়েই চলে আসবেন। ভাত খাবেন বলে জিল্লু সাহেবের কাছ থেকে তার মানিব্যাগটাও চেয়ে নিয়ে গেছেন।'

'লোকটার কি কোন বিপদ-আপদ...'

'আমার সেটা মনে হয় না, আফজাল ভাই। কারণ লোকটা জিল্লু সাহেবকে নিজের নতুন ফোন নম্বর বলে যে নম্বর দিয়ে গেছেন, সেটা পুরোপুরি ভুয়া। আমি ফোন করে দেখেছি।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন আফজাল সাহেব। হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে। ব্যাপারটা এখনও তাঁর কাছে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে।

'জিল্লু কোথায়, মালিহা? আছে কেমন?'

প্রশ্নের জবাবে টেলিফোনের অপর প্রান্তে মানুষটা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। 'আমি তো আজ সকালে এসেছি, আফজাল ভাই। শুনলাম, তিনি নাকি পরশু সন্ধ্যা থেকে রিসিপশনেই বসে আছেন। অনেকবার তাঁকে চলে যেতে বলা হয়েছে, যাননি। ভাইয়ের অপেক্ষা করছেন। অবশ্য পকেটে একটা টাকাও তো নেই...'

'এটা কী বলো তুমি? একটা মানুষ দু'দিন ধরে না খেয়ে-দেয়ে এক জায়গায় বসে আছে? তার পরিবার-পরিজন কেউ তাকে নিতে আসেনি?'

'নাহ্। এখন কী করব, আফজাল ভাই?'

মালিহা সারোয়ারকে প্রয়োজনীয় কটা নির্দেশ দিয়ে ফোন নামিয়ে রাখেন আফজাল সাহেব। বুকে এমন একটা ধাক্কার মত লেগেছে যে স্বাভাবিক ভাবে কিছু চিন্তাও করতে পারছেন না। আগামী বছর রিটায়ারমেন্টে যাচ্ছেন তিনি, জীবনের পথটা নেহায়েত সংক্ষিপ্ত নয়। তবুও এত দীর্ঘ জীবনে এমন হৃদয়হীন ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন কি না মনে করতে পারেন না।

আহা রে বেচারা জিল্লু! ভাইয়ের প্রতি অগাধ বিশ্বাস রেখে টাকা পয়সা সব তার হাতে তুলে দিয়ে বসে আছে। অপেক্ষা করছে বড় ভাই ফিরে আস্যার। অন্যেরা না হয় মানসিক ভারসাম্যহীনতার সুযোগে মানুষটাকে ঠকায় প্রতিনিয়ত। তাই বলে নিজের আপন ভাই তো মাত্র বিশটা হাজার টাকার জন্য তাকে রাস্তায় ফেলে যাবে?

পরিশিষ্ট

আফজাল সাহেবকে দেখে একগাল হাসে জিল্লু। এখনও বসা ক্লিনিকের রিসিপশনে, হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরা ভাইয়ের টেলিফোন নম্বর লেখা কাগজ।

'স্যার, দেখেন তো কী সমস্যা? ভাইজান ভাত খাইতে গেল, আর তো আসে না!'

'আসবে, জিল্লু। না এসে কোথায় যাবে?' নরম স্বরে বলেন তিনি। 'তুমি মালিহা ম্যাডামের সাথে ভেতরে যাও।'

'আপনি একটু খোঁজ করেন না, স্যার। কী হইল, বুঝতে তো পারতেছি না। বয়স্ক মানুষ, যদি অ্যাক্সিডেন্ট-ফ্যাক্সিডেন্ট হয়-টয়...'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন আফজাল সাহেব। হতে পারে লোকটার মাথা খারাপ। অথচ ভাইয়ের জন্য কী প্রগাঢ় মমত্ববোধ। কে জানে, হয়তো সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষ হলে এই মমত্ববোধের অস্তিত্ব থাকত না।

চলে যাচ্ছে জিল্লু লম্বা করিডরটা ধরে। একটা হাত মালিহার হাতে, অপর হাতে চোখ মুছছে বারবার।

'আপনি একটু খোঁজ নিবেন, স্যার। খোঁজ নিয়ে আমাকে জানাবেন। খুবই দুশ্চিন্তায় আছি। কী হইল মানুষটার? সরল সোজা একটা মানুষ...'

যেতে যেতে আবার ফিরে তাকায় সে।

'স্যার, রোখসানার নম্বরটা কি আপনার মনে আছে? তারেও একটা ফোন করবেন, প্লিজ। মনে কইরে করবেন কিন্তু, স্যার। আমি আপনের অপেক্ষায় থাকব। মনে থাকব তো?'

'হ্যাঁ, থাকবে!'

'প্রমিজ বলেন, স্যার।'

'হ্যাঁ, প্রমিজ!'

আফজাল সাহেব অবশ্যই তাঁর কথা রাখেননি। জিল্লু হোসেন নামের মানুষটার সাথে সেটাই ছিল তাঁর শেষ দেখা। তবে যথাসাধ্য করেছিলেন তিনি। সম্ভবত মানবতার

খাতিরেই।

জিল্লু হোসেনের মেজ ভাই আর বোনটাকে খবর দেয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। এমনকী দিয়েছিলেন ক্লিনিকের প্রাথমিক খরচের হাজার দশেক টাকাও। আজকালকার যুগে কে করে কারোর জন্য এতটা?

তবে শেষ খবর শুনতে পেয়েছিলেন, প্রাথমিক খরচের টাকাটা শেষ হবার পর জিল্লুকে হাসপাতাল থেকে ছাড়িয়ে নেয়া হয়েছে। এরপর আর কোন খবর তাঁর জানা নেই।

কে জানে, হয়তো আবার কোথাও ফেলে রেখে আসা হয়েছে মানুষটাকে। নিঃস্ব, কপর্দকহীন অবস্থায়; যেন বারবার আপনজনেদের (!) কাছে ফিরে যেতে না পারে। হয়তো কোনও রেলস্টেশনে, কিংবা অচেনা কোনও শহরে ভাই কিংবা বোনের অপেক্ষায় প্রহর গুনছে মানুষটা। রোদে পুড়ছে, বৃষ্টিতে ভিজছে!

একজন রাজাকার মারা গেছে

এক.

একজন রাজাকার মারা গেছে এবং আমি বুঝতে পারছিলাম না যে আমি কি করবো।

আমি বুঝতে পারছিলাম না কারণ মৃত মানুষটি আমার বড় চাচা। চৌদ্দ বছরের জীবনে এই আমি তার অনেক স্নেহ-ভালোবাসা পেয়েছি। তবে শুধু আমি নই। এ বাড়িতে আমার মত যতগুলি ছেলেমেয়ে আছে। তারা সবাই পেয়েছে। বড় চাচা আমাদের সবার ভীষণ প্রিয় মানুষ ছিলেন।

বড় চাচার মধ্যে পছন্দ করার মতো অনেক কিছুই ছিল। আমাদের বিশাল জয়েন ফ্যামিলিতে সবার খেয়াল তিনি রেখেছেন। তার হুকুম ব্যতীত এ বাড়িতে গাছের পাতাও কখনও নড়েনি। যদিও তিনি একদম রাগী ছিলেন না।

এ বাড়ির পনের জন ছেলেমেয়ের সবাই তাকে খুবই পছন্দ করতো। প্রতি মাসে সকলে নতুন কাপড় পেতো; প্রতি সপ্তাহের শুক্রবার এক গাড়ি আইসক্রিম বাড়িতে আনা হতো; তিনি ছাড়া আর কারও এ বাড়িতে বাচ্চাদেরকে শাসন করার অধিকার ছিল না। শুধু তাই নয়, আমাদের কারও যদি প্রাইভেট টিউটর পছন্দ না হতো, তৎক্ষণাৎ তাকে ভাগিয়ে দিতেন। প্রতি মাসে এ বাড়ির লাইব্রেরিতে আমাদের জন্য নতুন গল্পের বইয়ের ঢের লাগিয়ে ফেলা হতো।

বড় চাচাকে আমরা সবাই খুব ভালোবাসতাম। শুধু বছর কয়েক আগে আসিফ ভাইয়ার কি যে হয়েছিল! নিজের বাবার দিকেই কেমন অদ্ভুত করে তাকিয়ে থাকতো। একদিন অনেক ঝগড়া হলো আর ভাইয়া বাড়ি ছেড়ে চলে গেলো।

আমি সেদিন খুব কেঁদেছিলাম। লুকিয়ে লুকিয়ে। সাজু আপা ছাদে আমাকে জড়িয়ে ধরে বসেছিল। আমাকে কান্না থামাতে বলে সাজু আপা নিজেও কাঁদছিল।

সাজু আপার ভালো নাম সানজানা। মেজো চাচার মেয়ে। আমি অনেক প্রশ্ন করেও সেদিন আপার মুখ থেকে আসিফ ভাইয়ার চলে যাবার কারণটা শুনে উঠতে পারিনি। অবশ্য সাজু আপা এরপর প্রায়ই আমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে কিছু বই এনে দিত। এবং সবার চোখের আড়ালে পড়তে বলতো। অদ্ভুত ছিল সেই সব বই। ১৯৭১ সালে নাকি বাংলাদেশে অনেক বড় একটা যুদ্ধ হয়েছিল। সেই যুদ্ধের ওপর লেখা। বইগুলো আমি খুব আগ্রহ নিয়ে পড়তাম। কারণ এর আগে এমন কোনো বই আমি দেখেনি।

আমাদের এই সুবিশাল "তাহিয়া কুটির" এ মুক্তিযুদ্ধের ওপের কোনো বই ছিল না!

তাহিয়া আমার বড় চাচীর নাম। বেচারী বড় চাচার মৃত্যু সংবাদ শোনার পরপরই অজ্ঞান হয়ে গেছিলেন। এবং জ্ঞান ফেরার পর থেকেই বিলাপ করে কাঁদছেন। বড়

চাচার লাশ বাড়িতে আনা হলে যে কি হবে, কে জানে!

সাজু আপা বসেছিলেন চাচীর পাশেই। কাঁদতে কাঁদতে আপারও চোখ মুখ ফুলে একাকার। আমার ধারণা হয়েছিল "রাজাকার" বড় চাচাকে উনি একদম পছন্দ করেন না।

অবশ্য বড় চাচা যে রাজাকার ছিলেন ৭১' সালে, সেটা আমি জেনেছি আজ সকালে। এটাও জেনেছি যে এত বড় এই বাড়িও নাকি সেই সময়ে আয় করা টাকা থেকে তৈরি। শোকের বাড়ি আসলে খুবই অদ্ভুত একটা জায়গা। দাফন করা সত্যেরা সব বের হয়ে আসে।

বাড়ির মোটামুটি সবাই নিচের এই হলরুমে আছে। আত্মীয়-স্বজনেরা জড়ো হতে শুরু করেছে। এ বাড়ির সাদা পাঞ্জাবি পরা পুরুষেরা সব ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছে। ব্যবস্থা হয়ে গেছে কুরআন তেলাওয়াতের। আগরবাতির প্রচণ্ড ঘ্রাণ আর সম্মিলিত কুরআন পড়ার শব্দে বাতাসটা কেমন ভারী হয়ে উঠেছে। কি অদ্ভুত!

'সাজু আপা!'

'উ!'

'সাজু আপা, কাঁদো কেন তুমি? তুমি না...'

'একটা মানুষ মারা গেছে, কাঁদবো না? বড় চাচা যেমনই হোক, আমাদের তো ভালোবাসতো। বল্, বাসতো না?'

আমার কেমন বিভ্রান্ত লাগে। আনমনে মাথা ঝাঁকাই আমি। সাজু আপা আমার গা ছুঁয়ে বলে, 'শোন রাহাত, চাচার ব্যাপারে আর কখনও কোনো কথা আলোচনা করবি না। মানুষটা তো মরেই গেছে। না? এখন কথা বাড়ালে পরিবারের বদনাম হবে...'

সাজু আপাকে আর ভালো লাগে না আমার। হলের বাতাসে কেমন যেন নিঃশ্বাস আটকে আসে। বাইরে বের হয়ে আসি আমি। আমার বাবা-চাচারা সবাই কোথাও না কোথাও তো আছে।

আমি শুনলাম বাবা বলছে, 'ভাইজান কাউকেই বঞ্চিত করেনি। এত সুন্দর করে সব বন্টন করে রেখে গেছে। আবার শুনেছি বড় ভাবীর নামে আলাদা কিছু ক্যাশও আছে।'

'সে যাই হোক।' বলেন ছোট চাচা। 'আমাদের জন্য যা রেখে গেছেন, হেসেখেলে দিন কাটবে সবার। আসিফকেও ওর অংশটা বুঝিয়ে দিতে হবে।'

'সেটাই!' মাথা ঝাঁকান সেজ চাচা। 'যাই বলো আর তাই বলো, একদিক দিয়ে হিসাব করলে এই সবই কিন্তু ভাইজানের। আমরা এত বছর পরিশ্রম করে বাড়িয়েছি ঠিকই। কিন্তু মূলধনটা তো ওনারই। নিজের পয়সা তো উনি আমাদের সাথে শেয়ার না করলেও পারতেন।'

আর শুনতে ইচ্ছা হলো না। তড়িঘড়ি পা বাড়ালাম দোতলার দিকে। এত খারাপ লাগছে! আমার যে বাবা সব সময় নামাজ পড়তে বলে, সত্য কথা বলতে বলে। সেই

বাবা কিনা বড় চাচার মত রাজাকারের সম্পত্তি পেয়ে আনন্দিত?

বড় চাচা... সেই মানুষ বড় চাচা। যে নাকি মুক্তিযুদ্ধের সময় অল্পবয়স্ক ছেলেদেরকে পাকিস্তানিদের হাতে তুলে দিতো মেরে ফেলার জন্য। আর মেয়েদেরকে পাকবাহিনীরা সাথে নিয়ে যেত। তারপর নাকি ধনসম্পদ লুট করে মানুষের বাড়িতে বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিত। অনেক মানুষ নাকি স্রেফ সেই আগুনে পুড়েই মারা গেছে। আর চাচা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে।

আসিফ ভাই নিজে আমাকে বলেছে এসব কথা।

আমার ভাবনাগুলো সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। তাহলে কি সাজু আপার কথাই ঠিক। মানুষ মরে যাবার পর তার সমস্ত অপরাধ কি ক্ষমা পেয়ে যায়? যত বড় অপরাধই হোক?

নিচের হলঘরে সবাই আছে। একমাত্র নিপা চাচী ছাড়া। আমার খুব ইচ্ছা হতে লাগলো নিপা চাচীর কাছে একবার যেতে। বেচারীর কি অবস্থা কে জানে! কেউ তো ওনার খবর নেয়নি।

ও হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি...নিপা চাচী বড় চাচার দ্বিতীয় স্ত্রী!

দুই.

নিপা চাচী দাঁড়িয়ে আছেন জানালার ধারে। ওনার পরনে গতকালের রঙিন শাড়িটাই এখনও। বড় চাচীর মত কাপড় বদলে হালকা রঙের শাড়ি পরেননি। চাচীর গা-ভরা গহনাও রয়েছে তেমনই।

আমি গিয়ে চাচীর বিছানায় বসি। চাচীকে দেখে মনে হচ্ছে যে ঘণ্টাখানেক আগে হয়তো একটু কেঁদেছিলেন। চোখের কোণে সামান্য একটু পানি ছাড়া তেমন কোনো শোকের চিহ্ন নেই তাঁর চেহারায়।

অবশ্য চাচীকে আমি আজীবন খুব চুপচাপ, পড়ুয়া আর একটু উদাস উদাস দেখেছি। নতুন করে আর কিভাবে শোক করবেন?

'তুমি গয়না খুলো নাই কেন, চাচী মা?'

আমার কাছে এসে বসে সুন্দর করে হাসেন নিপা চাচী। 'গয়না সব খুলতে হবে নাকি রে?'

'খুলবে না? মেজ চাচী যে বললো, "কুটি ভাবীরে গয়না খুলতে বল্!!" আমি তো সেই কথাই বলতে এলাম।'

'ছেলে থাকলে গয়না খুলতে হয় না রে, গাধা! বড় বউকে দেখিসনি?'

'কিন্তু তোমার তো ছেলেমেয়ে নাই!'

আরও সুন্দর করে হাসেন চাচী, 'কে বলেছে ছেলে নাই? তুই আছিস না? তুই আমার ছেলে না?'

কথা ঠিক। চাচী আমাকে আম্মার চাইতেও বেশি আদর করে।

'তোর এবার বয়স কত হলো? চৌদ্দ, না?'

'হুঁ!'

'মায়ের শরীর থেকে গহনা খুলতে এলে আমার ছেলে তখন ঠেকাতে পারবে না? পারবে তো ঠেকাতে?'

জবাবে আমি জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাই। পারবো কি পারবো না। সেসব না ভেবেই। চাচীকে দেখে দীর্ঘদিন খাঁচায় থাকার পর মুক্তি পাওয়া পাখির মত মনে হচ্ছে। আনন্দটা আমার মাটি করতে ইচ্ছা হয় না একটুও।

চাচীর ঘর থেকে চট্ করে বেরিয়ে আমি তাই রওনা দিলাম ছাদের দিকে। যাওয়ার সময় দাদীজানের ঘরের সামনে দিয়ে যেতে হবে...এই ভেবে যা একটু ভয় ভয় লাগছিল। দাদী আম্মাকে আমি প্রাণের চাইতেও বেশি ভালোবাসি। দাদাজান মারা যাবার দিন দাদী আম্মার সেই চিৎকার করে কান্নার কথা আমি কোনোদিনও ভুলতে পারবো না। পাঁচ মিনিট পর পর অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলেন। জ্ঞান ফিরতেই আবার সেই কান্না। তিনদিন দাদী আম্মা কিছু খাননি পর্যন্ত।

আজকে উনার কি অবস্থা কে জানে। বড় ছেলে মারা গেছে তাঁর। বৃদ্ধা মায়ের চোখের সামনে সন্তান মারা যাবার চাইতে বেশি শোকের আরকি হতে পারে?

নিশ্চয়ই কেউ না কেউ আছে দাদী আম্মার সাথে। আমি তাই পা টিপে টিপে বন্ধ দরজার সামনে দিয়ে পার হয়ে গেলাম। আসিফ ভাই চাদে বসে আছে, জানি আমি। চাচাকে কবর দেয়া হয়ে গেলেই আবার হয়তো চলে যাবে।

'রাহাত!' আমার দিকে না তাকিয়েই ডাকে ভাইয়া।

কাছে গিয়ে দাঁড়াই আমি, 'কি করে বুঝলে যে আমি?'

'তুই ছাড়া আমাকে এই ছাদে খুঁজতে আর কে আসবে?'

বাবারা এখনও নিচে জটলা করে আলোচনা করছে। ছাদের রেলিঙের ওপর বসে ভাইয়া সেটাই দেখছিল। চোখমুখ অসম্ভব থমথমে।

'জানিস রাহাত, আমাদের বাড়ির নাম তাহিয়া কুটির কেন? দাদী আম্মার নামে বাড়ির নাম না হয়ে কেন আমার মায়ের নামে হলো, জানিস?'

'কেন?'

'কারণ আম্মার অমতে তোর বড় চাচা তোর নিপা চাচীকে বিয়ে করেএনেছিল। আম্মা যেন সংস্যার ছেড়ে চলে না যায়, সেজন্য এত খাতির্।'

'চলে গেলে কি হতো?'

'চলে গেলে যে বংশে বাতি দেয়ার কেউ জন্ম নিতো না। আমি জন্ম নিতাম না। হিন্দু মেয়ের গর্ভের সন্তানকে তোর চাচা বংশের উত্তরসূরী বানাতো? কক্ষনো না!'

আমি জানি যে বড় চাচাকে ভাইয়া "বাবা" ডাকে না। তাই "তোর চাচা" শুনে অবাক লাগলো না। কিন্তু "হিন্দু মেয়ে" আবার কি রকম কথা?

'তোর নিপা চাচী যে হিন্দু, সে কথা জানিস? আমার প্রশ্নের জবাবে আবার প্রশ্ন

করে আসিফ ভাইয়া। 'তোর চাচা ৭১' সালে বেচারীর ভাইদেরকে পাক বাহিনীর হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল। আর উনাকে ধরে এনে নিজে বিয়ে করেছিল। উনার বাবা ছিল স্বর্নকার। অনেক ধনী। আমাদের এই পুরো বাড়ি তৈরির খরচ নাকি সেই সোনা লুটের টাকা থেকেই এসেছে।'

'চাচীকে জোর করে ধরে এনেছিল?'

'হ্যাঁ। ধরে এনে উনার ধর্ম বদলে নাম রেখেছিল "রুখসানা"। তোর নিপা চাচী তখন কি করেছিল, জানিস?'

'কি?'

'কেউ রুখসানা নামে ডাকলে জবাব দিতো না। শেষমেষ তোর বড় চাচা ছাড়া সবাই তাকে আসল নামেই ডাকতে শুরু করেছিল।'

আমার খুব অবাক লাগছিল এই ভেবে যে ভাইয়া এতসব কাহিনী জানলো কি করে? আরও ভাবছিলাম, ভাইয়া তা বড় চাচার কবরে মাটি দেবে। তবে কি ভাইয়াও চাচাকে মাফ করে দিল?

'হয়তো খানিকটা মাফ করেছি।' মাথা ঝাঁকিয়ে বলে ভাইয়া। 'জীবিত রাজাকারকে বাবা ডাকা যায় না। মৃত মানুষকে বোধহয় ডাকা যায়...তাই না? আফটার অল, আমি তার একমাত্র পুত্র!'

জবাব দিতে পারলাম না আমি। কারণ ভাইয়ার কথা শেষ হয়নি।

'...জানিস, তোর নিপা চাচীর কোনো সন্তান কেন নেই?...তুই ছোটমানুষ, তবুও বলি! তোর নিপা চাচীর কোনো সন্তান নেই কারণ যখনই উনার পেটে বাচ্চা আসতো, বাবা তাকে নষ্ট করে ফেলার ব্যবস্থা করতো। হিন্দু মেয়েকে ধরে এনে বিয়ে করা যায়, তার সম্পত্তি দিয়ে প্রাসাদ বানানো যায়, তাকে নিয়ে এক বিছানায় থাকা যায়...কিন্তু সন্তান? ছিঃ ছিঃ ছিঃ। ৭১' এর শান্তি কমিটির একনিষ্ঠ সমর্থক আমার রাজাকার বাবা হিন্দু মেয়ের গর্ভের সন্তানকে বানাবে বংশের উত্তরসূরী?...অথচ জানিস, সেই হিন্দু মেয়ের সম্পদ হাতানোর আগে তোর চাচা কি ছিল? তোর চাচা ছিল সেই সোনার দোকানের কর্মচারী...'

আমি ভালোই বুঝতে পারছিলাম যে ভাইয়া মদ-টদ কিছু খেয়ে নেশা করে এসেছে। এটাও বুঝতে পারছিলাম যে নিজের মায়ের সাথেও ভাইয়া কেন সম্পর্ক রাখেনি। বড় চাচার এসব কাজে চাচীর সমর্থনকে ভাইয়া আসলে কিছুতেই মানতে পারছে না।

আমিও কি পারছিলাম?

বোধহয় না। ঘণ্টা খানেকের ব্যবধানে নিজেকে অনেক বড় মনে হচ্ছিল আমার। আর নিপা চাচীর দুঃখে বুকটা ভেঙে যাচ্ছিল। আহারে! উনার কষ্টের তো কোনো সীমা-পরিসীমা নেই।

এবার দাদীর ঘরের দিকে রওনা হলাম আমি। সন্তান শোকে কাতর এক মায়ের

মুখোমুখি হবার মত সাহস মনে হয় আমি এতক্ষণে জোগাড় করতে পেরেছি।

শেষ কথাগুলো

বাড়িতে আনা হয়েছে বড় চাচার মৃতদেহ।

একটা জ্যান্ত মানুষ কি সহজেই না একটা লাশ হয়ে যায়। গতকাল পর্যন্ত চাচা কি ভীষণ জীবন্ত ছিল; দ্বিতীয় স্ট্রোকের ধকলটা ধীরে ধীরে সামলে উঠেছিল। আর আজ সে লাশ হয়ে শুয়ে আছে। একটু পরেই যাকে নিয়ে যাওয়া হবে জানাজার জন্য।

দোতলায় দাঁড়িয়ে হলঘরে ফুপুদের মাতম দেখলাম আমি অনেকক্ষণ। আমার ঠিক পিছনেই দাদী আম্মার ঘর। দরজা এখনও বন্ধ। বেচারী হয়তো এখনও জানে না যে তাঁর পুত্রের মৃতদেহ বাড়িতে আনা হয়েছে।

আমার দাদী আম্মা। মোটা কাঁচের চশমা পরা, জুবুথুবু এক অশিক্ষিত নারী। দীর্ঘ চৌত্রিশটা বছরেও যার শরীর থেকে গ্রাম্য গন্ধটা এতটুকুও মুছে যায়নি। ডান চোখের ছানী অপারেশনের কথা শুনলে যিনি আঁতকে ওঠেন। মুখে দাঁত প্রায় একটাও নেই, তবু পান তার খাওয়া চাই-ই-চাই। স্যারাদিনে তাঁর একমাত্র কাজ টিভিতে পুরনো আমলের বাংলা সিনেমা দেখা এবং পানদানীতে ক্রমাগত পান ছেঁচা।

আর হ্যাঁ, বাড়ি বাচ্চাদেরকে অদ্ভুত সব গল্প বলে হাসানো। যেসব গল্পের প্রায় সবগুলোই "গুটুলি" নামের এক মামদো ভুতকে দিয়ে শুরু হয়।

খুব শান্তভাবে ভেতরে ঢুকলাম আমি। যেন কোলে করে দাদীকে নিচে নামানোর কাজটা ছোট চাচার বদলে আজ আমাকে দেয়া হয়েছে। বুকে আগলে তাঁকে আমি নিয়ে যাবো শোকের সমুদ্রে।

পিতলের পানদানীর ক্রমাগত শব্দ...একটু ভোঁতা অথচ ধাতব একটা শব্দ...টুন্-টুন্-টুন্!! গভীর মনযোগে পান ছেঁচেই যাচ্ছেন আমার দাদী আম্মা।

'পান খাইবা, বাপজান?'

রোজ একই প্রশ্ন করেন দাদী। জবাবে আমি বাধ্য ছেলের মত হাত পেতে দাঁড়াই। আজও দাঁড়ালাম। এবং ছেঁচা পানও পেলাম। শুধু মুখে দেয়া হলো না।

বসলাম দাদী আম্মার পায়ের কাছে।

'বড় চাচার লাশ এসেছে!'

'হুঁ!' আমার মনে হলো যেন একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনলাম।

'বড় চাচার লাশ এসেছে, দাদীমা!'

'তো কি করবো, বাপজান?' শান্ত, শীতল একটা কণ্ঠস্বর!

'দেখতে যাবো না? শেষবারের মত দেখবে না?'

এবার আমার চোখের দিকে তাকান দাদীমা। তাঁর ছানী পড়ে খোলা হয়ে যাওয়া চোখটাতেও কি অদ্ভুত একটা আলো। যেন অন্য জগতের মানুষ।

'কারে দ্যাখবো, বাপজান?'

কেমন সন্দেহ হয় আমার। 'কি হয়েছে তোমার? আমার কথা শুনতে পাচ্ছো না?'

'কি শুনতাম?'

দাদী আম্মাকে গভীর মমতায় আগলে ধরি আমি। 'চলো, দাদী আম্মা। নিচে চলো। তোমার ছেলের লাশ এসেছে।'

জবাবে আমার একটা হাত কোলের মাঝে টেনে নেন তিনি।

'না গো, বাপজান। আমার ছেলের লাশ আসে নাই। একটা রাজাকারের লাশ আসছে! রাজাকারেরা এই দ্যাশের কুনো মায়ের সন্তান না!'

কথাগুলো বুঝতে পারলেও কেমন অবিশ্বাস্য শোনায় আমার কানে। এই মা তাঁর সন্তানের মৃতদেহ দেখবে না? দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বলে সন্তানকে তিনি স্বীকারও করবেন না?

আমি ঠিক বুঝতে পারি না।

আমি বুঝতে পারি না আমাদের এই শিক্ষিত, অত্যাধুনিক সমাজ ব্যবস্থা যখন রাজাকারদেরকে সমাজ থেকে ছুঁড়ে ফেলতে পারে না। এই গ্রাম্য-অশিক্ষিত মা কিভাবে এত সহজে কাজটি করতে পারে? এই গ্রাম্য-অশিক্ষিত মা কি করে স্বাধীনতার এতগুলো বছর পরও গভীর ঘৃণা পুষে রাখলো এক রাজাকারের প্রতি... যেখানে রাজাকার লোকটি তাঁর নিজের গর্ভে ধরা সন্তান?

রাজাকারদের বিচার করতে তো বুক কাঁপে আমাদের সমাজ ব্যবস্থাটারও। অথচ এই গ্রাম্য মায়ের বুক কাঁপেনি নিজ সন্তানের মৃত্যু সংবাদেও। চোখে আসেনি এক ফোঁটা অশ্রু।

এখন দাদী আম্মাই আমাকে আগলে ধরে বসেছিলেন!

খুব ছোটবেলায় নিপা চাচী একবার দুর্গাপুজা দেখাতে নিয়েছিলেন আমাকে। দাদী মাকে এখন ঠিক সেই দুর্গার মতো মনে হয় আমার। সর্বশক্তিধারী, দুর্গতিনাশীনি আর ভীষণ ভীষণ বিশাল আমার দাদী আম্মা...আমার অসহায়, জুবুথুবু, গ্রাম্য দাদী আম্মা!

একজন রাজাকার মারা গেছে। এবং দুঘণ্টা আগেও বুঝতে পারছিলাম না যে আমি কি করবো। কিন্তু এখন পারি।

একজন রাজাকার মারা গেছে।

স্রেফ একজন রাজাকার!

পিঞ্জিরা

এই গল্পের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক। শুধুমাত্র রাজিয়া বেগম নামের মানুষটি সত্য। এবং সত্য তাঁর কষ্টগুলো। সোনার খাঁচায় নির্বাসিত সেই নারীর কারাগ্যার জীবনের একটি একটি অন্ধকার অনুভব সত্য। "রাজিয়া বেগম" চরিত্রটি নামের আড়ালে সেই অসম্ভব দুঃখী মানুষটির জন্যে রইলো এক বুক ভালোবাসা!!

এক.

নিজেকে পরিত্যাক্ত নগরী মনে হয়। প্রতিদিন, প্রতি নিয়ত।

জানালায় দাঁড়িয়ে দেখেন তিনি পরিবারের মানুষগুলোর সুখের উচ্ছ্বাস। সম্পর্কে এরাই সবচাইতে আপন তাঁর, অথচ মাঝখানে ব্যবধান এখন যোজন যোজন মাইলের। সেই সময় বহু আগেই হারিয়ে গেছে, যখন এই পরিবার আর্বতিত হতো তাকে ঘিরেই। তখন এত ধনী ছিল না এই পরিবার। আর ছিল না বলেই হয়তো মানুষগুলো ছিল ভীষণ কাছাকাছি। একসাথে জড়াজড়ি করে বেড়ে ওঠা লতানো গাছের মতন।

জানালায় দাঁড়িয়ে চার চাকার আলিশান বাহনটার চাকচিক্য দেখেন তিনি। অনেক আগে স্বামী নামের পুরুষটি এমন একটি গাড়ি কিনে দেবার ওয়াদা তাকে করেছিলেন। মানুষটি ওয়াদা রেখেছেন। তবে বাহনটি এনেছেন পরিত্যাক্ত স্ত্রীর জন্য নয়; তার জীবনের নতুন নারীর জন্য।

খুব সাবধানে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন রাজিয়া বেগম। দশ বছর আগে পরিত্যাক্ত এই নগরীর বুকে দীর্ঘশ্বাসগুলোই এখন শুধু অবশিষ্ট আছে। তবু সংকোচ হয় ভীষণ। কেননা এত বিশাল সংস্যারটির কোথাও এখন আর নিজেকে প্রয়োজনীয় মনে হয় না তাঁর। ১৪ বছর বয়সে যে পুরুষের হাত ধরে এই সংসারে এসেছিলেন, দীর্ঘ ২৫টা বছর যার বুকের সাথে মিশে নিবিড় ভালোবাসায় সংস্যার করেছিলেন–সেই মানুষটার সাথে বিগত দশটা বছরে দশটি কথাও বোধহয় হয়নি।

দশ? নাকি এগারো?...হবে কিছু একটা। সময়ের গতিশীলতার মূল্য বহু বহু আগেই তার জীবন থেকে হারিয়ে গেছে। যেদিন থেকে অচ্ছ্যুৎ হয়ে গেছেন এই সংসারে।

কেউ তাকে বলে দেয়নি, তবু তিনি জানেন। তিনি জানেন যে এই বিশাল সংস্যারটার কোথাও তাকে এতটুকু প্রয়োজন পড়ে না। যেদিন স্বামীর পাশে অন্য এক নারীর আগমন হয়েছিল, পরিবারের সবাই সেদিন তাঁর পাশে ছিল ঠিকই। তবে সময়ে সময়ে বদলে গেছে সব। বাড়ির বউয়ের পক্ষ ছেড়ে সবাই একসময় আপন করে

নিয়েছে নিজেদের ছেলেকেই। দেবর, ননদ, ভাসুর, জা, শ্বাশুড়ী...এমনকী ছেলেমেয়েরাও হয়তোবা। তিনি শুনেছেন বড় মেয়েটির সাথে আজকাল তার বাবার সম্পর্ক বেশ ভালো। নিজের সংসারে বাবাকে আন্তরিকতার সাথেই আপ্যায়ন করে সে। অথচ সেই ভাঙনের সময়ে এই মেয়েটিই সবচাইতে আপন ছিল মায়ের। শেষ সন্তান সুমি অবশ্য তখন অনেক ছোট। আর এখন সবে H.S.C সীমানায়। তার কথা বিশেষ জানেন না রাজিয়া বেগম। পরিবারের সবার সাথেই মেয়েটার অন্যরকম একটা দূরত্ব। সে থাকে একদম নিজের মতন।

গাড়িটা চলে যায়। পেছনে পেছনে আরও তিনটে। পরিবারের সবাই মিলে কোথাও বেড়াতে যাচ্ছে বোধহয়। ২৫/৩০ জন মানুষের এই বিশাল সংস্যারটার কোথায় যেন একটা অদ্ভুত মিল আছে, ছন্দ আছে। শুধু তিনিই হয়ে পড়েছেন বহিরাগত। ১২ ফুট বাই ১২ ফুটের এক কারাগারে বন্দী।

না, স্বেচ্ছা বন্দী নন। সংসারে যখন ক্রমশ অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ছিলেন, তীব্র অভিমান আর আত্ম মর্যাদা বোধই তাকে নিয়ে এসেছিল চার দেয়ালের নিবিড় সান্নিধ্যে। প্রতি মুহূর্তে আশা করেছেন, কেউ না কেউ এসে অভিমান ভাঙিয়ে নিয়ে যাবে তাঁকে। স্বামী কিংবা শ্বাশুড়ী, কিংবা জা'-দের কেউ, কিংবা রুদ্র। কতই না শখ করে ছেলের নাম রেখেছিলেন রুদ্র। একমাত্র পুত্র তাঁর!

যদিও তার জন্য কেউ-ই আসেনি। কেউ না। কিংবা কে জানে, হয়তো তাঁর অন্তরালে চলে যাওয়াতে সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাসই ফেলেছিল। বাড়ির একপ্রান্তের কোণের এক কামরাকে সেই নারীর কারাগ্যার বানিয়েছিল তারা, যে নারী নিজের জীবনের পুরোটা ব্যয় করেছেন শুধুমাত্র এই সংসারের মঙ্গলে।

তবু তিনি বেঁচে থাকেন। প্রতিদিন তিনি বেঁচে থাকেন রুদ্রের আশায়। তাঁর রুদ্র একদিন ভেঙে দেবে এই কারাগ্যার। এ বাড়ির প্রতিটি অন্ধকারকে সে বদলে দেবে আলোতে। উড়িয়ে নিয়ে যাবে বাবার একনায়কতন্ত্র।

দেবেই! তিনি জানেন। এই বংশের একমাত্র পুত্র সন্তান রুদ্র, একমাত্র উত্তরসুরী। একদিন সে তার ক্ষমতা বুঝে নেবেই। মায়ের খাতিরে হলেও নেবে।

তিনি সেই দিনের অপেক্ষাতেই থাকেন!

দুই.

যতটা সম্ভব আওয়াজ না করে ভেতরে এসে ঢোকে মেয়েটি। হাতে খাবারের ট্রে। মেয়েটি তাকে অসম্ভব ভয় পায়, জানেন রাজিয়া বেগম। আবার কেন যেন তাঁর মনে হয়, তাকে বুঝি ভালোও বাসে। ভালোবাস্যার কারণটা যদিও তিনি আন্দাজ করতে পারেন না।

দুই বছর হলো এ বাড়ির বউ হয়ে এসেছে নীরা। রুদ্রের বাবার একমাত্র বোনকে বিয়ে দিয়ে ঘরজামাই আনা হয়েছিল। তাদেরই একমাত্র ছেলের বউ নীরা। মেয়েটা

অসুখী, বোঝেন তিনি। আর কেউ না বুঝলেও তিনি বোঝেন। কে জানে, সবাই বুঝেও হয়তো না বোঝার ভান করে! দিনরাত নিজের সর্বস্ব সংস্যারটাকে দিয়ে চলেছে মেয়েটা; নীরবে। এমনকী তাঁর মত পরিত্যাক্ত মানুষকেও সে ভোলেনি। প্রতিবেলায় নিজে ডাকতে আসে খাওয়ার জন্যে। আর তিনি না গেলে নিজেই ট্রে সাজিয়ে নিয়ে আসে। এবং সবচাইতে অদ্ভুত বিষয়, মেয়েটা তাকে কোনো সম্বোধনে ডাকে না।

ট্রে-টা সামনে নামিয়ে রাখে নীরা। চিনি ছাড়া এক কাপ চা আর টোস্ট করা রুটি দু পিস। ডায়াবেটিসের রোগী তিনি। দুপুর বারোটার দিকে হালকা কিছু খাবার তাকে খেতে হয়। নতুবা শরীর কাঁপে, মাথা ঘোরায়।

'তুমি গেলে না কেন, নীরা?'

'ভালো লাগে না।' বিছানায় এলোমেলো কাঁথাটা ভাঁজ করতে করতে জবাব দেয় মেয়ে। 'বাসায় কত কাজ আছে!'

'স্যারাদিন কাজ করলে হবে? বাসায় কত কাজের লোক, তারা করলেই তো হয়।'

'একটা দীর্ঘশ্বাসের আওয়াজ যেন শোনা যায়। 'কাজ করবো না তো কি করবো?' বসে বসে আজেবাজে চিন্তা করার চাইতে কাজ করা ভালো।'

'রাসেল...খুব জ্বালায় তোমাকে, না?'

'জ্বালায় আর কখন! সে তো বাড়িতেই থাকে না।'

আজকাল রাসেল যে নীরাকে মারধোরও করে, ঠোঁটের কোনে ক্ষতচিহ্নটা দেখেই বুঝতে পারেন রাজিয়া বেগম। তবে কিছু জিজ্ঞাসা করেন না। বরং ধমকে ওঠেন।

'মিথ্যা বলো কেন? রাসেল তোমার গায়ে হাত তোলে...তোলে না?'

হেসে ফেলে নীরা। 'আপনি এত রাগী কেন?'

'চুপ, ফাজিল মেয়ে। যা জানতে চাইলাম, জবাব দাও।'

এসে রাজিয়া বেগমের সামনে দাঁড়ায় নীরা। 'হ্যাঁ, রাসেল খুব জ্বালায় আমাকে। বিনা কারণে গায়ে হাত তোলে। সে আমার সাথে মোটেও ঘর করতে চায় না।'

'তুমি চাও?'

'না।'

'তাহলে চলে যাও না কেন?'

'কোথায় যাবো? বাপের বাড়ি? সেখানে কেউ আমাকে মেনে নেবে না।'

'বোকা মেয়ে!'

আবারও হাসে নীরা। 'আজ কি আপনার মেজাজ বেশি খারাপ? আমাকে এত ধমক দিচ্ছেন কেন?'

'অসহ্য! এই ফাজিল মেয়ে এত কথা বলে কেন?'

'বলবো না কথা। যদি আমাকে একটা প্রমিস করেন।'

'আবার কথা বলে! যাও সামনে থেকে!'

মুখটা অন্ধকার করে ট্রে-টা নিয়ে চলে যায় নীরা। আর চলে যাবার পরই খারাপ

লাগা বোধটা ঘিরে ধরে তাঁকে। কি দরকার ছিল এমন ব্যবহার করার? প্রতিবারই ভাবেন, আর করবেন না এমন। এবং কোনোবারই পারেন না। বিগত এগারোটা বছর ভীষণ রকম মেজাজী আর খিটখিটে করে দিয়েছে তাঁকে।

আবার দরজায় উঁকি দেয় মেয়েটা।

'গোসল করে রেডি হয়ে যান। আজ ডাইনিং রুমে খেতে হবে!'

'মানে?'

'মানে কিছু না।'

'তুমি জানো, আমি ডাইনিং রুমে যাই না।'

'আজ গেলে কিছু হবে না। বাসায় আজ কেউ নেই।'

'সবাই গেছে?'

'হ্যাঁ। বিয়েতে। বড় মামার বিজনেস পার্টনারের মেয়ের বিয়ে।'

'রুদ্র-ও?'

'না। সে বাড়িতে এবং বলেছে দুপুরে আপনার সাথে খাবে। ডাইনিং হলে।'

'রুদ্র বলছে?'

'হ্যাঁ। আরও বলেছে আপনাকে গরুর মাংস রান্না করতে। তার নাকি ভীষণ খেতে ইচ্ছা করছে।'

'পারবো না। কতকাল রাঁধি না, সব ভুলে গেছি।'

'ঠিক আছে, রাঁধতে হবে না। কিন্তু ডাইনিং রুমে খেতে আজ হবেই।' বলেই চলে যায় মেয়েটা। কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই।

আনমনে হেসে ফেলেন রাজিয়া বেগম। না জানি কতদিন পর!

ছেলে তবে মায়ের কথা মনে করে এখনও?

তিন.

রুদ্রের দরজায় দাঁড়িয়ে লম্বা নিঃশ্বাস নেয় নীরা। এই মানুষটা পৃথিবীতে তার সবচাইতে আপন। তবু প্রতিবারই ঘরে ঢুকতে কেমন ভয় ভয় লাগে। লোকে বলে, রুদ্রের মেজাজ নাকি তার বাবার মতন। কিন্তু কথাটা একদম ঠিক নয়। ছেলেটা মায়ের মেজাজ পেয়েছে। কষ্ট গোপন করতে রাগের বর্ম পরে থাকে।

'বল্টুর বাবা কি বাড়ি আছেন?'

'যদি বল্টুর মা হন, তাহলে আছি।' হালকা সুরে জবাব আসে। তারমানে মেজাজ ভালো।

আজ আর ভয়ে ভয়ে ঢুকতে হয় না। ভালোই লাগে নীরার। বিয়ের পর এই প্রথম পুরো বাড়িটা একদম ফাঁকা।

'বল্টুর মায়ের উদ্দেশ্য কি?' হাসিমুখে বলে রুদ্র। একটানে নীরাকে টেনে নেয় কাছে।

'করো কি? কেউ চলে আসবে!'

'কে আসবে তোমাকে বাঁচাতে? ভূত? এই তিনতলায় ভূতেরও আস্যার ক্ষমতা নেই।'

দুহাতে রুদ্রের গলা জড়িয়ে ধরে নীরা। 'সুযোগ পেয়ে দিনে দুপুরে ডাকাতি?'

'কি আশ্চর্য! আমি তোমাকে কিছু করেছি নাকি?'

'ইস্! এখন সাধু সাজা হচ্ছে!'

'যাও! আর আসবো না।' নীরাকে ছেড়ে দিয়ে লম্বা হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে রুদ্র। এ ঘরে কোনো পর্দা নেই, রুদ্রের পছন্দ নয়। মেঘলা দিনের আলতো রোদ এসে মাখামাখি হয়ে যায় মানুষটার নগ্ন উর্ধ্বাঙ্গে, এলোমেলো চুলে, বাদামী চোখের তারায়। আশ্চর্য সুন্দর একটা মানুষ!

আনমনে চেয়ে থাকে নীরা। রুদ্র মানুষটার জন্মই যেন হয়েছে শিল্পী হবার জন্যে। সুরের জগতে ডুবে থাকা আত্মমগ্ন মানুষটার আছে তীব্র আকর্ষণী ক্ষমতা। যে ক্ষমতা থেকে সে কেন, কোনো নারীরই বোধহয় মুক্তি নেই।

প্রেমিকের পাশে এসে বসে নীরা। 'তোমাকে আমি ভালোবাসি কেন?'

'কেন ভালোবাসো?' প্রশ্নের জবাবে প্রশ্ন আসে।

'এটা অন্যায়। আমার স্বামী আছে, সংস্যার আছে।'

'হ্যাঁ। এমন এক স্বামী যার একাধিক শয্যা সঙ্গিনী আছে। তোমাকে যে মানুষই মনে করে না।'

'আমার কথা বাদ। কিন্তু যখন তোমার বিয়ে হবে? যখন তোমার সংস্যার হবে?' হাজার বার করা প্রশ্নগুলো আবারও করে নীরা। এবং জবাবও পায় আগের মতোই।

'শোনো বল্টুর মা, আমি বিয়ে করলে তোমাকে করবো। নতুবা বিয়েই করবো না।'

রুদ্রের বুকে মাথা রেখে হাসে নীরা। 'রয়েল বেঙ্গল টাইগ্যার গুলি করবে তোমাকে!'

'বল্টুর দাদা? ওই ভদ্রলোকের সাহস আছে আমাকে গুলি করার? অবশ্য ভদ্রলোকের নতুন বউ যদি...'

'দশ বছর পরেও "ম্যাডাম" নতুন বউ হয় কি করে?'

হেসে ফেলে রুদ্র। 'ভালো একটা নাম দিয়েছো তুমি–"ম্যাডাম"!'

'তুমিও তো ভালো নাম দিয়েছে–"বল্টুর দাদা"।'

জীবনে প্রথমবারের মত দিনের আলোয় ভালোবাস্যার মেয়েটিকে বুকে জড়িয়ে শুয়ে থাকে রুদ্র! দু বাহুর শক্ত বাঁধনে আগলে রাখে।

'নতুন একটা গান করেছি। শুনবে?'

'উহুঁ! তুমি আমাকে শক্ত করে ধরে রাখো, গান গাইতে হবে না। আমি আর পাঁচ মিনিট আছি।'

'মোটেও না। যতক্ষণ সবাই ফিরে না আসে, তুমি আমার সাথে থাকবে।'

'আহা! দুপুরের রান্না কে করবে?'

'এ বাড়িতে কাজের লোকের অভাব আছে?'

'না থাকুক। আজ আমি আর মা মিলে রাঁধবো।'

বিস্মিত হয় রুদ্র, 'মা??'

'ইয়েস স্যার, মা। আজ মা রান্না করবেন আপনার জন্যে। আপনার ফেভারিট–গরুর মাংস।'

'কি বলো! মা রাঁধবে?'

'শুধু তাই না। মা আজ আপনার সাথে এক টেবিলে খাবে বলেছে।'

'সত্যি?'

'তো মিথ্যা নাকি? তুমি ফাজিল একটা, মা থেকে দূরে দূরে থাকো। মা তোমাকে কত মিস্ করে জানো?'

একটা গহীন দীর্ঘশ্বাস বের হয় রুদ্রের বুক থেকে। 'সংকোচ হয়, নীরা। ভীষণ সংকোচ হয়। বাবাকে আমি ঠেকাতে পারিনি সেই অন্যায়টা থেকে।'

'শুধু তুমি নও, কেউ পারেনি। কিন্তু একদিন পারবে। একদিন বাবার এই কারাগ্যার থেকে মা-কে মুক্ত করে নিয়ে যাবে তুমি। একটা নতুন জীবন দেবে। নতুন সুখ।'

'সত্যি কি পারবো কখনও?'

'পারবে। অবশ্যই পারবে। পারতে হবে। তোমার জন্যে, মা-র জন্যে।'

নীরার কপালে গভীর ভালোবাসায় ঠোঁট ছোঁয়ায় রুদ্র। 'এবং তোমার জন্যেও! আমাদের ছোট্ট একটা সংস্যার হবে, নীরা। মা, তুমি আর আমি।'

'সত্যি হবে, বল্টুর বাপ?'

'হবে। হতেই হবে।'

'রুদ্র!'

'হুঁ...।'

'তুমি আমাকে ভালোবাসো, রুদ্র?'

নিজের শরীরটা দিয়ে নারীকে আড়াল করে ফেলে রুদ্র, চোখে চোখ রাখে গভীর আবেগে।

'আমি জানি না, নীরা। সত্যি জানি না। এই সব ভালোবাসবাসি বোধহয় আমার জন্যে নয়...'

রুদ্র লক্ষ করে না যে খুব সন্তপর্ণে অশ্রু গোপন করে নীরা। পুরুষ শরীরটা তখন নারী শরীরকে ভালোবাসতে শুরু করেছে...

চার.

মা আর ছেলে পরস্পরের সাথে কি সহজ ভাবেই না কথা বলছে! খাওয়া বাদ দিয়ে তাই দেখে নীরা। যদিও মুখে বলেছিলেন আসবেন না। তবু ঠিকই রান্নাঘরে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন রাজিয়া বেগম। নীরা জানতো, রুদ্রের নাম করলে তিনি না এসে পারবেন না। পৃথিবীর নিবিড়তম সম্পর্কের বাঁধনে আবদ্ধ মানুষ দুজনের মাঝে কি ভীষণ একটা দূরত্ব। আর এ দূরত্বের কারণে দুটি মানুষই নিঃসঙ্গ, একা।

ডাইনিং হলে নয়, খাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে ব্যালকনীর টেবিলটায়। রান্না স্যারতে স্যারতে বেশ দেরি হয়ে গেছে, কমে এসেছে তাই রোদের উত্তাপ। রুদ্র শেষ করার আগেই চায়ের সরঞ্জাম গুলো নিয়ে আসে নীরা। খাওয়ার সাথে সাথে এক কাপ চা না পেলে মানুষটার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।

দুষ্টু বালিকার মত করে হাসেন রাজিয়া বেগম। 'অ্যাই ফাজিল মেয়ে, খাও না কেন?'

'এই মেয়ে ভাত খাবে কি করে, স্যারাদিনে তো কয়েক গ্যালন চা খায়!' জবাব দেয় রুদ্র। 'খেয়ে দেখো, নীরা বেগম। আমার মা কি সাংঘাতিক রাঁধতে জানে, একবার খেয়েই দেখো!'

'এই ফাজিল মেয়েও ভালো রাঁধে।'

'কি যে বলো না, মা! এর রান্না তো মুখেই দেয়া যায় না। নীরা বেগম পারে শুধু কথা বলতে।'

ভেংচি কাটে নীরা। 'এই লোকটা এত অকৃতজ্ঞ কেন?...'

'আহারে! সত্যি বললে দোষ...'

'মিথ্যুক কোথাকার...'

মনোযোগ হারিয়ে ফেলেন রাজিয়া বেগম। কয়টা বাজে এখন? চারটা, সাড়ে চারটা হবে। বিকেল হয়ে এসেছে ইতিমধ্যেই–শীতের আগমনী সংকেত। এই বাড়িটা যেদিন তৈরি সম্পূর্ণ হয়েছিল, সেদিন থেকেই ব্যালকনীটা ভীষণ পছন্দ ছিল রুদ্রের বাবার। নিজের মনমতো করে তিন তলায় বিশাল এই ব্যালকনীটা বানিয়েছিলেন তিনি। প্রতিদিন বিকালে দুজনে একসাথে বসে চা খেতেন এই টেবিলে। তাদের ভীষণ একান্ত , নিবিড় সময় ছিল সেগুলো। এমন এক বিকেলেই তো আর একটি সন্তান পৃথিবীতে আনবার স্বপ্ন বুনেছিলেন তারা দুজন। একসাথে!

একবারও তো ভাবেননি যে সেই স্বপ্ন বদলে যাবে দুঃস্বপ্নে। এই বংশের আর একজন উত্তরসুরী তো আসবে পৃথিবীতে, তবে এসেই চলে যাবে। এই সংসারের মানুষগুলো মনপ্রাণে শুধু পুত্র সন্তান কামনা করে। কে জানে, হয়তো একজন মৃত উত্তরসুরী ছিল সেই অন্যায় কামনারই শাস্তি। বিধাতা প্রদত্ত শাস্তি!

কত কিছু হয়ে গেল মাত্র একটা বছরে। মৃত একটি পুত্র সন্তানের মা হলেন, আর সেই নিদারুন মানসিক বিপর্যয়ের সময়টিতে রুদ্রের বাবা খুঁজে নিলেন নতুন এক

সঙ্গিনী। স্বামীর হাত ছাড়লেন, শ্বাশুড়ী আঁচল। জীবন থেকে হারিয়ে গেল সেই সংস্যার, যা তাঁর পরিচয় ছিল। একমাত্র পরিচয়।

তিনি উচ্চ শিক্ষিত নারী নন। স্বামী-সংস্যার-সন্তানের মাঝেই ছিল তাঁর বেঁচে থাকা। নিজের একটি আপন পরিচয়ের যে প্রয়োজন আছে, কখনও তো ভেবেও দেখেননি। আজকাল মনে হয়, থাকলে ভালোই হতো। অন্তত বর্তমানের এই মৃত আর অদৃশ্য জীবনের বদলে তিনি বেঁচে তো থাকতে পারতেন। এখন তিনি রুদ্রের মা। কেবলই রুদ্রের মা। কেউ যদি পারে, কেবল রুদ্রই পারবে তাকে মুক্ত করে দিতে। একমাত্র রুদ্রই পারবে তার বাবার প্রতিদন্দ্বী হতে। এবং তিনি জানেন, সেই দিন আসবেই।

আচ্ছা, রুদ্রের বাবা কি এখনও এই ব্যালকনীতে বসেন? কি ভাবেন বসে? তাঁর কথা কি মনে করেন কখনও? নাকি নতুন অর্ধাঙ্গিনীকে নিয়ে এত ব্যস্ত থাকেন যে...

জানেন না কেন, একটা ঘিনঘিনে অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত শরীরে। তাঁর এই চেয়ারটিতে নিশ্চয়ই সোনিয়া নামের সেই নারী বসে। এই চেয়ারটি এখন সোনিয়া নামের সেই নারীর, যে সম্পর্কে তাঁর সতীন হয়। আর তিনি কিনা সেই চেয়ারেই বসে আছেন...ছিঃ!

আচমকাই উঠে চলে যান রাজিয়া বেগম। রুদ্রকে বিস্মিত করে রেখে। তবে নীরা বোধহয় অবাক হয় না, বরং হাসে।

'যাক্! প্রাথমিক বিজয়।'

ধীরেসুস্থে সিগারেট ধরায় রুদ্র, 'মানে কি?'

'অত কিছু যদি তুমি বুঝতে, তাহলে তোমার বুদ্ধি আমার মতোই হতো।'

'তারমানে আমার বুদ্ধি নেই?'

'আছে। তবে আমার চাইতে কম।'

'শোনেন নীরা বেগম–অতি চালাকের গলায় দড়ি।'

'দড়ি তো গলায় আটকেই আছে, নতুন করে আর কি হবে?'

'বোঝা গেল না। এত হেঁয়ালী করে কথা বলো কেন?'

'থাক্ সাহেব, বুঝতে হবে না। আপনার কথা বলুন। রাতে ফিরতে দেরি হবে? কোথায় যাবেন?'

উঠে পড়ে রুদ্র। 'ভালো কথা মনে করেছো। আজ রাতে ফিরবো না। বন্ধুরা স্যারারাত আড্ডা মরবো।'

'কোথায়?'

'আছে একটা জায়গা, তোমাকে বলা যাবে না।'

চলে যায় রুদ্র। পিছনে রেখে যাওয়া মেয়েটির যে অসম্ভব মন খারাপ হয়, লক্ষ্যও করে না।

পাঁচ.

রুদ্র যে পরিবারের সবাইকেই এড়িয়ে চলে, ভালোই জানেন ফোরকান উদ্দীন সাহেব। বেশ ক'বছর হলো সে ডাইনিং রুমে খেতেও আসে না। বাসায় ফেরে গভীর রাতে। দিনের বেলা বাড়ি থাকলেও থাকে ঘুম। ব্যান্ড মিউজিক না কি যেন হাবিজাবি করে বেড়ায়। টাকার যোগান কোথা থেকে হয়, তাও বুঝতে পারেন না তিনি। ছেলে কখনও তার কাছে টাকাও চায় না। ভাবগতিক দেখে মনে হয় এখন পুরোপুরিই বাউণ্ডুলে হয়ে গেছে রুদ্র।

সবই জানেন তিনি। তবু খাবার টেবিলে বসে প্রতিদিনই প্রশ্ন করেন, 'রুদ্র কই? ফেরেনি এখনও?'

তার প্রশ্নের জবাব দেয় না কেউ। শুধু রুদ্রের দাদী সুফিয়া খানম মাথা নাড়েন। সত্তোরর্ধ বয়সেও এই ছোটখাটো বৃদ্ধাই শক্ত হাতে ধরে রেখেছেন সংসারের হাল। তিনি কঠোর, মেজাজী এবং জেষ্ঠ্য সন্তান ফোরকান উদ্দীন সাহেবের প্রতি তার পক্ষপাতিও অপরিসীম। এমনকী "ম্যাডাম"-ও তাকে সমীহ করে বৈকি।

টেবিলে খাবার পরিবেশন করতে করতে প্রতিদিনই এসব লক্ষ্য করতে থাকে নীরা। রাসেল এবং রুদ্র ছাড়া এ বাড়িতে অন্য কোনো পুত্র সন্তান নেই। সুতরাং আপাতত সেই এ বাড়ির একমাত্র বউ।

খাবার টেবিলে আরও আছেন দুজন চাচা, তিনজন চাচী। কারণ মেজ চাচা অস্ট্রেলিয়ায় থাকেন। আরও আছেন রাসেলের বাবা-মা। এবং সোনিয়া ম্যাডামের ভাই। সে নাকি রুদ্রের মামার "পরম বন্ধু"!

বাড়ির বাচ্চাদের ডিনার টাইম অনেক আগে শেষ। সুতরাং এখনকার খাওয়া শেষ হলেই আজকের দিনের মত ছুটি নীরার।

'গরুর মাংসটা খুব ভালো হয়েছে।' খাতির করার জন্যে মিষ্টি কণ্ঠে বলেন ম্যাডাম। এই সংসারে এক নীরাই তার বশীভূত নয়। তবে চেষ্টা চলছে!

জবাব দেয় না নীরা। জাম বাটিটা এগিয়ে দেয় ফোরকান উদ্দীন সাহেবের দিকে। 'আপনি একটু নেবেন, বড় মামা?'

ফোরকান উদ্দীন সাহেব মানুষটা যতটা লম্বায়, তার সাথে মিলিয়ে চওড়াতেও। এবং রুদ্রের চাইতেও অনেক অনেক বেশি রূপবান তিনি। আর ব্যক্তিত্ব এমন যে কোনো মানুষ চাইলেও তাকে অগ্রাহ্য করতে পারবে না।

সুন্দর চোখগুলো নীরার মুখের ওপর নিবদ্ধ হয়।

'নেবো? ডাক্তার তো মানা করেছে, বউ মা।'

'একটু নিলে কিচ্ছু হবে না। বড় মামী অনেক যত্ন করে রেঁধেছেন।'

নীরার মনে হয় বুঝি বাজ পড়েছে ঘরে, সবাই সহসাই এমন নিশ্চুপ হয়ে যায়। তবে ফোরকান উদ্দীন সাহেবের হাত থমকায় মাত্র ক্ষণিকের জন্যেই। সহজ, সাবলীল ভাবেই খেয়ে চলেন তিনি।

'রুদ্রের আম্মা কোথায়, বউ মা? তাকে বলবে, অন্তত রাতের খাবারটা যেন আমাদের সাথে খেতে আসে।'

নীরা জানে, এসব নিয়ম রক্ষার কথা। তবু মাথা ঝাঁকায়, 'জ্বী, মামা। বলবো। মামীর শরীরটা আজকাল খুব খারাপ থাকে তো!'

'স্যারা জীবনই তো শুনলাম অসুস্থ।' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলেন রাসেলের আম্মা, মানে নীরার শ্বাশুড়ী। 'কতকাল আগের ঘটনা, এখন তো ভুলে গেলেই হয়।'

'আহ্ জাহানারা!' মৃদু কণ্ঠে ননদকে বকেন মেজচাচী। 'জীবনের সব কথা অত সহজে ভোলা যায় না।'

'তুমি যাই বলো, মেজ ভাবী। বড় ভাবীকে আমার কোনো কালেই ভালো লাগেনি। বাপরে বাপ, সতীনকে এত হিংসা?'

'তোর সতীন থাকলে তুই-ও এমন করতি, জাহানারা।' বোনকে বকেন সেঝ চাচাও। 'আমার তো মনে হয় আরও খারাপ করতি।'

'হ্যাঁ। সতীনের মাথার সব চুল ছিঁড়ে নিতো একসাথে।' পরিবেশ হালকা করার জন্যে হাসেন রাসেলের বাবা রফিস সাহেব। তবে পরিবেশ বোধহয় হালকা হয় না।

'চুপ করো!' এবার নিয়ন্ত্রণ বুঝে নেন সুফিয়া খানম। নীরার দিকে অগ্নি দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকেন তিনি। 'খাওয়ার টেবিলে অত আজাইরা প্যাচাল পারবা না কেউ।...বড় বউ সত্যি রান্না করছে, নীরা?'

'জ্বী, নানী আম্মা! রুদ্র ভাইয়া মামীকে রিকোয়েস্ট করেছিলেন দুপুরে গিয়ে...'

'রুদ্রের আম্মা থাকলে ভালো হতো আজ।' আস্তে আস্তে বলেন ফোরকান উদ্দীন সাহেব। 'নেই যখন, তোমাদেরই বলি। আমি ঠিক করেছি রুদ্রকে বিয়ে দেবো। বাউণ্ডুলে ছেলের জন্যে বিয়েই আদর্শ চিকিৎসা।'

'রুদ্র মনে হয় না মানবে...'

'আমার তো মনে হয় বুদ্ধিটা ভালোই...'

'আগে রুদ্রের সাথে কথা বলে দেখা উচিত...'

'ছেলে বড় হয়েছে, বিয়ে তো দিতেই হবে...'

ইত্যাদি ইত্যাদি না জানি আরও কত রকম মন্তব্যে মুখর হয়ে ওঠে ডাইনিং হলটা। যদিও নীরার মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌঁছায় না কিছুই। তার শুধু বারবার মনে হয়...

এখানেই তবে কাহিনীর পরিসমাপ্তি?

নাকি ভীষন ক্ষমতাধর বাবার বিরুদ্ধে, পরিবারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বিদ্রোহ করে বিজয় আনতে পারবে রুদ্র! সত্যি পারবে?

একটা ঝড়ের পূর্বাভাসে অস্থিরতায় ডানা ঝাপটায় নীরার চড়ুই পাখি মন।

ছয়.

আকাশ জোড়া নক্ষত্রের নিচে শুধু তারা দুজন। সে...এবং লিজা।

না, একা নয়। ছাদে আছে আরও অনেক বন্ধু। আর কিছু বান্ধবীও। তবু ভাবতে ভালো লাগে রুদ্রের। ভাবতে ভালো লাগে যে আকাশ জোড়া নক্ষত্রের নিচে স্বপ্নের মেয়েটির হাত ধরে দাঁড়িয়ে সে। কতদিন পর!

দুবছর আগে লিজা যখন কানাডায় পড়তে চলে গেলো, সেদিনও এমনই এক রাত ছিল। দুজনে ছাদে দাঁড়িয়ে বুনেছিল দীর্ঘ কথোপকথনের ছায়াপথ। মেয়েটি হয়তো আশা করছিল রুদ্র ফেরাবে তাকে, যেতে দেবে না। কিংবা যাবার আগে দেবে ভালোবাস্যার কোনো ওয়াদা।

রুদ্র সেসব কিছুই করেনি। কেন যেন পারেনি। যদিও লিজা জানতো পুরুষটির তীব্র ভালোবাস্যার খবর। এরপর প্রতি বছরই একবার করে দেশে এসেছে লিজা। তবুও রুদ্রের পক্ষে সম্ভব হয়নি। নিজের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অন্ধকারে সে হয়তোবা জড়াতে চায়নি স্বপ্ন-নারীর জীবনকে। তবে একটাবারের জন্যে অস্বীকারও করেনি ভালোবাস্যার সত্যতা। কলেজ জীবনের প্রেম লিজা–প্রথম এবং শেষ।

প্রতিবারই দেশে ফিরে এমন একটা পার্টি দেয় লিজা। দীর্ঘ একটা বছর পর সেটাই হয় রুদ্রের সাথে তার প্রথম দেখা। রুদ্র জানে যে তার মতো লিজাও অপেক্ষায় থাকে এই একটি দিনের। অবশ্যই থাকে!

একটু কাছে এসে দাঁড়ায় লিজা। এত কাছে যে পাওয়া যায় শরীরের ভীষণ রকম মেয়েলী সৌরভটাও! খুব সাধারণ জিনস্ আর টি-শার্ট মেয়েটার পরনে। তবু কি চমৎকার যে লাগছে!

দারুণ লোভ হয়, তবু ছুঁয়ে দেখে না রুদ্র। কোথায় যেন একরকম সংকোচ, দ্বিধা। লিজাকে নিজের জীবনের রূঢ় সত্যগুলো বলতে না পারার কারণে কোথায় যেন অন্তহীন এক ব্যবধান। ইচ্ছা হয় কখনও কখনও, তবু মেটানো হয় না এই দূরত্ব। কেন যেন মনে হয় লিজা বুঝবে না। অনুভব করতে পারবে না সত্যগুলোর বেদনাকে। হয়তো তারপর থেকে কারণে অকারণে হেয় করবে রুদ্রকে। কিংবা হয়তো ভুল বুঝবে। লিজাকে কেন যেন ঠিক ভরসা করে ওঠা হয় না।

রুদ্রের একটা হাত নিজের হাতের মাঝে নেয় লিজা।

'কতদিন পর দেখা হলো, বলতো?'

একটুখানি হাসে রুদ্র। 'এক বছর, দুই মাস, সাত দিন।'

'গতবার চলে যাওয়ার আগে কি বলেছিলাম?'

'বলেছিলি–বাবার বিজনেসে জয়েন করতে।'

'তাহলে করিসনি কেন?'

'তুই সত্যি চাস?'

'হ্যাঁ।'

লিজার ধূসর চোখজোড়ায় চোখ রেখে যেন এক মহাকাল সময় ব্যয় হয়। 'তুই সত্যি আমাকে সে রূপে দেখতে চাস–একজন বিজনেস ম্যান?'

'অবশ্যই চাই। আর কতদিন বাউণ্ডুলে থাকবি, নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে না!'

'সেটা তো আমার পা হবে না, বাবার পায়ে দাঁড়ানো হবে।'

'কি যে বলিস আবোল-তাবোল!'

'বাদ দে না! তোর কথা বল্–কয়টা ফিরিঙ্গি বয়ফ্রেন্ড যোগাড় করলি?'

খিলখিল আওয়াজে হাসে লিজা। 'তার কি কোনো হিসাব আছে নাকি? জন, টম, লিও, হ্যারি...ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। তোর কি খবর? প্রেমিকা পেলি?'

'কত্ত! হাসিনা, সখিনা, মর্জিনা, শিলা, মীরা, নীরা...' আচমকা থমকে যায় রুদ্র। আসলে শেষ নামটা থমকে দেয় তাকে। নীরার সাথে মিথ্যা বলে এসেছে; বুকের মাঝে কোথায় যেন খচখচ করে চলেছে সেই মিথ্যার কাঁটা। মেয়েটাকে হয়তো সে ভালোবাসে, হয়তো বাসে না। কিন্তু এটা নিশ্চিত জানে যে নীরার মত ভালো এই গ্রহের অন্য কোনো নারী তাকে বাসবে না। বাসতে পারবে না। এমনকী লিজাও নয়!

টুকটাক ঘনিষ্ঠতা তো লিজা চলে যাবার পর অনেক মেয়ের সাথেই করেছিল সে। নীরাও সেরকম একজন–যার সাথে বন্ধুত্ব এবং ঘনিষ্ঠতা শুধুমাত্র লিজাকে ভুলে থাকবার জন্যেই। সত্যি বলতে কি, মেয়েটার একাকীত্ব আর কষ্টের ফায়দা তুলেছিল সে তখন। কিন্তু কীভাবে যেন সবকিছু এক সময় অন্য রকম হয়ে গেলো।

নীরা সেই প্রথম এবং একমাত্র মেয়ে–যার সাথে শরীর বিনিময় করে সে। এবং সেই একমাত্র মানুষ পৃথিবী নামের গ্রহের বুকে–যার সাথে জীবন বিনিময় করে। নীরা বোধহয়+ তার ছায়া!

'তোর সত্যি কোনো প্রেমিকা নেই, রুদ্র?'

'তোর সত্যি কোনো প্রেমিক আছে?'

'কতকাল আর একা থাকবি?'

'কেন...তুই আসবি না আমার কাছে?'

'এ ব্যাপারে তো অনেক আগেই তুই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলি কারণ হিন্দু ধর্মের কোনো মেয়েকে বউ হিসাবে তোর পরিবারে মেনে নেবে না। আজ আবার পুরনো কথা কেন!'

'তখন আমার জন্যে নিজের ধর্ম, পরিবার–সবই ছাড়তে রাজি ছিলি তুই। আজও কি আছিস?'

জবাব দেয় না লিজা। ছাদের অপর প্রান্তে বন্ধুরা হুল্লোড় করছে, সেদিকে চেয়ে থাকে আনমনে।

স্বপ্ন-নারীকে দুহাতে নিজের কাছে টেনে নেয় রুদ্র। 'অভিমান করেছিস?'

'করলেই বা কি। তোর তো কিছু যায় আসে না।'

'অবশ্যই যায় আসে।'

'ভালোবাসিস আমাকে?'

'এখনও সন্দেহ হয়?' বলতে বলতে লিজার কোমলতম ঠোঁটজোড়ায় নিজের ঠোঁটের রুক্ষতা টুকুন অর্পণ করে রুদ্র। গভীর আবেগে, নিবিড় ভালোবাসায়।

তবে কয়েক মুহূর্তই মাত্র। সাড়া দেয় না অপ্সরা। বরং ভীষণ অস্বস্তি ভরে নিজেকে সরিয়ে নেয় রুদ্রের বাহুবন্ধন থেকে বন্ধুদের ভীড়ে।

আকাশ জোড়া নক্ষত্রের নিচে একাই দাঁড়িয়ে থাকে রুদ্র। অপমানিত, অবহেলিত। ভালোবাস্যার অপমানে জ্বালা করতে থাকে বাউণ্ডুলে পুরুষের অন্তরটা।

সাত.

সবাই ভাবে নীরা বুঝি স্যারারাত জেগে থাকে মাতাল স্বামীর ঘরে ফেরার অপেক্ষায়। নীরা অবশ্য সত্যিই স্যারা রাত জাগে ভালোবাস্যার পুরুষটির অপেক্ষায়। তবে তার নাম রাসেল নয়, রুদ্র!

খুব সন্তপর্ণে তিনতলায় উঠে আসে নীরা। এ তলায় মাত্র পাঁচটা ঘর। বড় মামা আর "ম্যাডামের" বেডরুম, তাদের একমাত্র কন্যা তিথি এবং রুদ্রের ছোটবোন সুমির দুটি বেডরুম। একটা ছোট্ট লাইব্রেরী আর রুদ্রের কামরা। সুতরাং এত রাতে তিন তলায় তাকে কেউ দেখে ফেললে সর্বনাশ হয়ে যাবে। তবে বেশ চমৎকার একটা বাহানাও আছে–লাইব্রেরী। এককালে বইপত্রের স্তূপ গুলো ফোরকান উদ্দীন সাহেবের হলেও বহুকাল অবহেলায় পড়ে থাকবার পর আজকাল সেগুলো নীরার মালিকানাধীন। মামাই তাকে বলেছেন লাইব্রেরী রুমে পড়াশোনা করতে। মাঝে মাঝে সুমিকেও পাওয়া যায় সঙ্গী হিসাবে। এছাড়া এবাড়ির কারও তেমন কোনো আগ্রহ নেই বইপত্রের প্রতি।

সামনে সেকেন্ড ইয়ার অর্নাসের ফাইনাল পরীক্ষা, কারও চোখে পড়ে গেলে সে বাহনাই করা যাবে। যেন-তেন সাবজেক্ট তো নয়, সে ফিজিক্সের ছাত্রী ইডেন কলেজে।

তবু সাবধানেই পা ফেলে নীরা। আধঘণ্টা আগে রুদ্র ফিরেছে। দরজা নীরাই খুলেছিল। কোনো কথা না বলে সোজা ওপরে চলে গেছে রুদ্র। খোদাই জানে, মেজাজ আবার খারাপ কেন।

ভেতরে ঢুকে খুব আস্তে দরজাটা আটকে দেয় নীরা।

'কী ব্যাপার, সাহেব? সমস্যা কি?'

জানালার দিকে মুখ করে বিছানার ওপর বসে আছে রুদ্র, হাতে গিটার। আবছা অন্ধকারেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তার মেরুদণ্ডের দৃঢ়তা, কাঁধের প্রশস্ততা, বাহুর মুঠামতা আর মাথার এলোমেলো ঝাঁকড়া চুলের বন্যতা।

'কোনো সমস্যা নেই। যাও এখন থেকে! বিরক্ত করবে না!'

'চিৎকার কেন করছো?'

'বললাম না, যাও! অযথা বিরক্ত করছো।'

রুদ্রের পাশে এসে বসে নীরা। 'যতখুশি চিৎকার করো। আমি যাচ্ছি না।'

'আমাকে একটু একা থাকতে দাও, নীরা। প্লিজ!'

'বললেই হলো? তোমাকে আমি কোনোদিনও একা হতে দেবো না।'

'তোমার এই জিনিসটাই খারাপ। আমাকে বোঝো না তুমি।'

'আমি আগাগোড়াই খারাপ মানুষ, রুদ্র সাহেব!'

'কেন এত জ্বালাও?'

'তোমাকে যন্ত্রণা করতেই তো পৃথিবীতে এসেছি।'

'কতদিন জ্বালাবে?'

'মরে যাওয়া আগ পর্যন্ত।'

'কে মরবে–তুমি না আমি?'

'তোমাকে রেখে অন্তত আমি মারা যাচ্ছি না।'

'কেন?'

'যদি তুমি মেয়েদের সাথে টাঙ্কি মারো?'

এ পর্যায়ে হেসে ফেলে রুদ্র। 'সব প্রশ্নের জবাব কি তোমার কাছে কি রেডি-ই থাকে?'

তবে নীরা হবে না বসে থাকে আগের মতো গোমড়া মুখেই। 'তুমি না স্যারারাত বাসায় ফিরবে না। ফিরলে কেন?'

'তোমাকে মিস্ করছিলাম বলে!'

'ইস্! চাপা ছাড়ার আর জায়গা পাও না।'

নীরাকে কাছে টেনে নেয় রুদ্র। 'চাপা কেন হবে? তুমি বুঝতে পারো না?'

রুদ্রের বুকের সাথে নিজেকে মিলিয়ে ফেলে বাইশ বছরের তরুণী। 'না, পারি না। তুমিই তো বলো যে আমাকে ভালোবাসো না।'

'তোমাকে বুঝে নিতে হবে।' আমি বুঝতে চাই না, তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই।'

'তাই? তাহলে শোনে– 143...'

হেসে ফেলে নীরা। 'এর মানে কি হলো?'

'এর মানে হচ্ছে–I LOVE YOU!'

'I HATE YOU ও হতে পারে।'

'হ্যাঁ, পারে। তোমার যেটা ভালো লাগে। ভেবে নাও!'

'শোনেন সাহেব, ওসব চাপা বউয়ের জন্যে তুলে রাখুন।'

'কি আশ্চর্য! বউকেই তো বলছি!'

'আরে ধূর, ফাজলামি না। আমি সিরিয়াস। বাবা তোমাকে বিয়ে দিতে চান। মেয়েও মোটামুটি ফাইনাল।'

হাসে রুদ্র। 'আচ্ছা, এই জন্যেই আপনার মুখ অন্ধকার?'

'তো কি করবো? খুশিতে নাচবো?'

'নাচতে পারো! তোমার নাচ কখনও দেখা হয়নি।'

'যাও! খালি ফাজলামি!'

সঙ্গিনীকে শয্যায় নিজের গভীর সান্নিধ্যে টেনে নেয় রুদ্র। 'শোনেন ম্যাডাম ।;যদি কেউ আমার বউ হয়, সেটা শুধু আপনিই হবেন। আর কেউ নয়!'

কথোপকথন আরও দীর্ঘ হয়, তবে শরীরের বাক্য বিনিময়ে। এবং রাত ভোর হবার আগ পর্যন্ত বুনে চলে ভালোবাস্যার কবিতা। তবুও কোথায় যেন এক রকম শূন্যতা বেজে চলে নীরার বুকে। ভালোবাস্যার পুরুষটি কখনও তার ঠোঁটজোড়াকে স্পর্শ করে না। গভীর না হোক, একটি ছোট্ট চুমোতেও কখনও আলোকিত করে না ভালোবাস্যার মুহূর্তকে।

কেন?..."কেন"-এর জবাবটা জানে নীরা। সেই কোন এক কালে লিজা নামের এক স্বপ্ন-নারীর ঠোঁট স্পর্শ করেছিল সে। এবং সে ঠোঁট জোড়ার স্মৃতি আজও মিলিয়ে যায়নি তার অস্তিত্ব থেকে। মিলিয়ে যাক–সেটাও কখনও সে চায় না।

'রুদ্র! তুমি কি এখনও লিজাকে ভালোবাসো, রুদ্র?'

'লিজাকে? কক্ষনো না। আমি শুধু তোমাকে ভালোবাসি।'

'ভুলে গেছো লিজাকে?'

'নিঃসন্দেহে!'

'মিথ্যুক!' হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকেই বলে নীরা। শব্দটির গভীরতা শুধু অনুভব করতে পারে না তার ভালোবাসার পুরুষ।

আট.

আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বটাকে বহুকাল পর মনযোগ দিয়ে দেখেন রাজিয়া বেগম। ভোরের আবছা আলোয় ছায়াটাকে কেমন যেন মৃত মানুষের প্রতিবিম্বই মনে হয়। শরীরটা দলা পাকানো কাগজের মতন হয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে চোখ জোড়ার জৌলুস, আঙুলের পেলবতা। চুলগুলো হারিয়েছে তাদের ঘনত্ব, আঁধার কালো রঙ, এমনকী দৈর্ঘ্য পর্যন্ত। ডায়াবেটিস নামের অসুখটা যেন কেড়ে নিয়েছে তার যাবতীয় সৌন্দর্য্য।

নাহ্, কেবলমাত্র ডায়াবেটিস দায়ী নয়। অবশ্য জীবনই যখন হারিয়ে গেছে তার আঁচল থেকে, তখন সৌন্দর্য দিয়ে কি হবে? এ বাড়ির কেউ তাকে একটা জীবন্ত মানুষ পর্যন্ত মনে করে না। বেঁচে থেকেও তিনি মৃতদের দলেরই একজন। মৃত আপনজনদের তা-ও বছরে কয়েকবার মনে করা হয়–মৃত্যু বার্ষিকীতে কিংবা কোনো উৎসবে। তাঁকে তো তখনও কেউ মনে করে না।

শুনেছেন, আজকাল রুদ্রর বিয়ের কথা হচ্ছে। অথচ তাঁকে কেউ জানাবার প্রয়োজনও বোধ করেনি। প্রথম কয়েক বছর তিন জা এবং একমাত্র ননদটার ভালোই আসা-যাওয়া ছিল এ ঘরে। কখনও কখনও ড্রইংরুমে বসে টিভি-ও দেখতেন তিনি। ক্রমে ক্রমে সবাই সরে গেছে তাঁর মতো অপ্রয়োজনীয় মানুষটির থেকে। তাঁর সাথে

সম্পর্ক রেখে এ বাড়ির কর্ত্রী 'মিসেস সোনিয়া ফোরকান আহমেদকে কেউ চটাতে চায় না। ফোরকান উদ্দীন আহমেদ নামের মানুষটা পর্যন্ত পৌছাবার একমাত্র রাস্তাই তো সেই নারী।

জায়নামায গুটিয়ে রেখে তসবি হাতে সোফায় এসে বসেন তিনি। এই জায়নামায আর কুরআন শরীফটাই তো এগারো বছর বন্দী জীবনের একমাত্র সঙ্গী তাঁর। স্মৃতিতে কেমন যেন ঝাপসা হয়ে গেছে বাবার মুখটা। কিন্তু বাবার চিহ্ন হয়ে আছে এই কুরআন শরীফ। বড় মেয়ে জেসমিন হবার পর বাবা দিয়েছিলেন।

এখনও অবশ্য একজন মানুষ আছে তার সঙ্গী–নীরা নামের ফাজিল মেয়েটা। ফাজিল এবং বাচাল। এ ধরনের মানুষ ভীষণ অপছন্দ তাঁর। অথচ দিনের অন্য সময়ে না হোক, অন্তত এই ভোর বেলায় মেয়েটার অপেক্ষা করে থাকেন তিনি। মেয়েটা চা নিয়ে আসে তার জন্যে, কাজের লোকেরা কেউ ঘুম থেকে ওঠার আগেই।

ছোট একটা টেবিলের ওপর হাতের ট্রে নামিয়ে রেখে রাজিয়া বেগমের পায়ের কাছে বসে নীরা। দুষ্টুমি ভরে হাসে।

'গুড মনিং, বল্টুর দাদী!'

'ফাজিল মেয়ে! বল্টুর দাদী মানে কি?'

'রুদ্র বলেছে তার একটা ছেলে হলে নাম রাখবে "বল্টু"। তারমানে আপনি হচ্ছেন বল্টুর দাদী।'

আনমনে চায়ের কাপে চামচ নাড়েন রাজিয়া বেগম। 'দাদী হওয়াও আমার কপালে হবে না। দাদী হবে অন্য কেউ।'

হেসেই উড়িয়ে দেয় নীরা, 'ম্যাডাম সোনিয়া? উনি হবেন "নায়িকা দাদী"। শর্ট কামিজ পরা দাদী–হিন্দি সিরিয়ালের মতো।'

'ছিঃ, নীরা। এইভাবে বলতে হয় না। আমার সাথে সম্পর্ক যাই হোক, তোমার তো মামী শ্বাশুড়ী।'

'হ্যাঁ! এ বাড়ির সবাই সম্পর্কে আমার আপনজন। অথচ কেউ আপন নয়।'

'এইটা কেমন কথা?'

'ঠিক কথাই তো! দুনিয়াতে মেয়ে মানুষের কে আপন বলুন? যে বাবা-মায়ের ঘরে জন্ম, বিয়ে দিয়ে তারা পাঠিয়ে দেয় অন্যের ঘরে। শ্বশুর বাড়িতে আসা হয় না জানি কত স্বপ্ন নিয়ে, যেসব স্বপ্ন প্রতিদিন এক এক করে ভুল প্রমাণিত হয়।'

'যে পুরুষের পাশাপাশি কাটে বাকি জীবন, সে-ও কখনও আপন হয় না মেয়ে মানুষের। গর্ভে ধরা সন্তানেরও একদিন হয়ে যায় পরের স্বামী, পরের বউ!' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন রাজিয়া বেগম। 'ঠিকই বলছিস, ফাজিল মেয়ে। মেয়ে মানুষের আসলে আপন কেউ নাই!'

'থাক্। সকাল বেলা মন খারাপের কথা বলা লাগবে না। আপনি বরং এই বিস্কিট গুলি টেস্ট করেন। আমি বানিয়েছি। ডায়াবেটিক সুগ্যার দিয়ে।'

হাসেন রাজিয়া বেগম, 'কথা ঘুরানো, তাই না? এত ফাজিল কেন তুমি?'

নিজের জন্যে কাপ ভরে চা ঢালে নীরা। 'আমাকে ফাজিল বলার আগে নিজে ভেবে নিন–"তুই" বলবেন, না "তুমি"। এই "তুই"–"তুমি"র কনফিউশন আর ভালো লাগে না।'

'কি ব্যাপার, আজ এত খুশি কেন? সমস্যা কি?'

'সমস্যা কেন হবে?'

'অবশ্যই আছে সমস্যা। অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ!...রাসেল কই?'

'বাসায়। কাল রাতে ১২টার আগেই ফিরেছে।'

উচ্ছলতার কারণটা এবার বুঝতে পারেন রাজিয়া বেগম। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাই চুপ করে থাকেন, কথা বাড়ান না। এই হাসি-ঠাট্টা, আনন্দ সবই মেকী নীরার। মেয়েটা সেই দুর্ভাগা স্ত্রী, যার স্বামী রাতভর বাড়ি না ফেরাটাই শুভ। বাড়ি না ফেরার অর্থ হচ্ছে কোনো প্রেমিকার সাথে রাত্রি যাপন করছে সে। এবং সেটাই ভালো। কারণ রাতে বাড়ি ফিরলে নীরাকে মারধোর করাই হয় তার বিনোদনের একমাত্র উৎস। কোনো একটা অজানা কারণে স্ত্রীকে ভয়াবহ ঘৃণা করে সে।

মেয়েটা হয়তো রাতভর ঘুমায়নি, নীরবে কেঁদেছে। এ বাড়িতে তার কান্নার আওয়াজ পর্যন্ত নিষিদ্ধ। একটু আওয়াজ হলেই ক্ষেপে উঠবে শ্বাশুড়ী। রাজিয়া বেগম জানেন, জাহানারাও হাত তোলে নীরার শরীরে। কারণে-অকারণে খোটা দেয় শ্যামলা গায়ের রঙ নিয়ে। হুমকি দেয় লেখাপড়া বন্ধ করে দেয়ার। কে জানে, হয়তো তিনিও শ্বাশুড়ী হলে এমন আচরণই করতেন। এ সমাজে শুধু ছেলে সন্তানের মূল্য আছে, মেয়ে-সন্তানের নেই। আর সে মেয়ে যদি কালো হয়, তাহলে তো সে বাবা-মায়ের ঘাড়ের বোঝা আর শ্বশুড় বাড়ির বান্দী।

'চলে যা, নীরা। পালিয়ে যা।'

'কোথায় যাবো? বাপ-ভাইদের সংসারে?'

'না হয় সেখানেই গেলি।'

'বহুবার কাকুতি-মিনাতী করেছি আমি! মা বলে–সংসারে সব মেয়েকেই সমঝোতা করতে হয়। স্বামী তো একজনই। সে নাকি গায়ে হাত তুললে দোষ হয় না। বাবা বলে–বিবাহিত মেয়ের জন্যে বাপের বাড়িতে কোনো স্থান নেই। একমাত্র বোনটা আমার অনেক সুন্দরী, সব দোষ সে চাপিয়ে দেয় আমার চামড়ার রঙটার ওপর। আর ভাইয়ের...ভাইয়ের অবশ্য অনর্থক কথা বলেনি। পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে যে একজন বাড়তি মানুষ তারা খাওয়াতে পারবে না।'

নীরাকে কোনো সহানুভূতি দেখান না রাজিয়া বেগম। শুধু বলেন, 'এমনই হয় রে। মেয়ে মানুষের কপালের দোষ।'

'নাহ্, কপালের দোষ না। আমাদের সমাজ ব্যবস্থার দোষ। আমাদের দোষ। আপনি জানেন, কেন এ বাড়িতে পড়ে আছি আমি?...শুধুমাত্র লেখাপড়াটা শেষ করার

জন্যে। আমি সেইসব আত্মনির্ভরশীল মেয়েদের একজন হতে চাই, যারা নিজের জীবন নিজের ইচ্ছায় ব্যয় করে।'

'কি ভয়ঙ্কর কথা!'

'ভয়ঙ্কর না, সত্যি কথা। নারী মানে শুধু বিয়ে-শাদী, ঘর-সংস্যার না। নারী মানে আরও অনেক কিছু। আপনি জানেন, আমাদের সমাজে এখন কত স্বনির্ভর মেয়ে আছে?'

'তবুও...যত যাই বলিস, ঘরই মেয়েদের আসল জায়গা। আমার দাদী বলতেন–পুরুষ মানুষ জেদ করলে হয় বাদশা, আর মেয়ে মানুষ জেদ করলে হয় বেশ্যা! স্বনির্ভর বল্ আর যাই বল্, ওই রকম মেয়েদের সমাজ মন্দ বলে।'

'তা ঠিক, বলে। কিন্তু তাতে কি? অল্প কিছু এমন মানুষও আছে, যারা মেয়ে গুলিকে সাহস যোগায়। এমন স্বামীও আছে, যারা তাদের বউদের পাশে পাশে চলে–সামনে নয়।'

'সত্যি আছে?'

'আছে। পৃথিবীর সব মানুষ কি একরকম?'

একটা নিঃশ্বাস ফেলেন রাজিয়া বেগম, 'আমি তাহলে পুরানা হয়ে গেছি, না? কত কিছু জানি না এই পৃথিবীর।'

'যদি ঘর থেকে বের না হন, কি করে জানবেন?'

'ভালো লাগে না রে। একা একা কোথায় যাবো?'

'জীবনটা তো একাই কাটাতে হয়। একা একাই তো কাটছে আপনার-আমার জীবন।'

'তুই খুব একা, না রে?'

একটু খানি হাস্যার চেষ্টা করে নীরা, 'দুজন নিঃসঙ্গ মানুষ একসাথে হলে, তারা কি আর নিঃসঙ্গ থাকে?'

নয়.

দুপুরে কিংবা রাত্রে না হোক, সকালে অন্তত একবার বাড়ির অন্য নারীদের সাথে সাক্ষাৎটা একসময় তাঁর ভীষণ পছন্দের ছিল। এসময় পুরুষেরা থাকে যার যার কাজে, বাচ্চারা থাকে স্কুলে, মেয়েরা সবাই নিচতলার ড্রইংরুমে বসে সকালের নাশতা করে। দিনে অন্তত একবার শ্বাশুড়ী এবং জা'দেরকে কাছে পেয়ে নিজেকে আবার সেই পুরনো মানুষটা মনে হতো তাঁর; যখন তিনি এই সংসারের কর্ত্রী ছিলেন।

রুদ্রের বাবা সোনিয়া নামের সেই নারীকে বিয়ে করেছিলেন গোপনে। একদিন যখন জানাজানি হলো, স্ত্রীকে সদর্পে বাড়ি নিয়ে এলেন। রুদ্র তখন সদ্য কিশোর, নাইন কি টেনে পড়ে। বড় কন্যা সবে H.S.C। সুমি অনেক ছোট। এবং মাত্র ছ'মাস হয়েছিল দ্বিতীয় পুত্রটি মারা গিয়েছিল তাঁর। একটি আঘাত সামলে উঠতে না উঠতেই আরেকটি

ধাক্কা!

সংস্যার ছেড়ে চলে যেতে চাইলেন তিনি। কিন্তু সকলেরই কি পিছুটান! দেবরেরা হাতে-পায়ে ধরলো, জা'য়েরা বুকে জড়িয়ে নিলো, শ্বাশুড়ী কেঁদে বুক ভাসালেন। রুদ্রের বাবা দোহাই দিলেন ছেলেমেয়েদের, আর আপন ভাইয়েরা কসম দিলেন সংসারের। যার যা ইচ্ছা হলো একরকম বুঝিয়ে তাঁকে বেঁধে রাখা হলো এ সংসারেই। এই আশ্বাস দিয়ে যে তাঁর অবস্থান কোনো দিন কেউ নিতে পারবে না। সংস্যার তাঁর ছিল, মানুষেরা তাঁর ছিল–সব আজীবন তাঁরই থাকবে। শুধুমাত্র তাঁর। এমনকী স্বামীও।

সে দিনের কথা তিনি কোনো দিনও ভুলবেন না, যেদিন সেই নারী এ বাড়িতে প্রথম এসেছিল। রুদ্রের বাবা নিজে গিয়ে নিয়ে এসেছিলেন তাকে। স্যারাটা দিন দরজা আটকে শুধু কেঁদেই ছিলেন তিনি–প্রচণ্ড রাগে, অভিমানে, কষ্টে। হয়তোবা অজ্ঞানও হয়ে পড়েছিলেন। যখন জ্ঞান ফেরে, স্বামী তখন শিয়রে বসা। স্যারারাত ছিলেন পাশে। বারবার ক্ষমা চেয়েছেন, সোনিয়াকে "ভুল" বলে উল্লেখ করেছেন অসংখ্যবার। কত অনুরোধ আর অনুনয় এ সংস্যারটাকে ছেড়ে না যাবার জন্যে।

সে সবই ছিল ছেলে ভোলানো কথা, আজ বুঝতে পারেন তিনি। তাঁকে করুণা করেই যেন ছিল সবার ভালোবাস্যার (!) বাক্যগুলো তখন। কেননা পরবর্তী ১১ বছরে কিছুই সত্য হয়নি। কেউ থাকেনি তাঁর পাশে। কেউ না! এক একটা মুহূর্ত মৃত্যু সমান ভারী ছিল তাঁর ওপর, কেউ বুঝতে পর্যন্ত চেষ্টা করেনি! ক্রমশ শুধু দূরত্ব বেড়েছেই। আর বাড়তে বাড়তে কখন যে একসময় সন্তানেরাও ভীষণ দূরের মানুষ হয়ে গেছে, এখন আর মনেও করতে পারেন না তিনি।

এটা ঠিক যে সেদিনের পর তিনিই সরে গেছেন রুদ্রের বাবার জীবন থেকে। এবং এ-ও ঠিক যে রুদ্রের বাবাও কখন আর তাঁর সাথে সহজ সম্পর্ক বুনতে চেষ্টা করেননি। বরং স্বেচ্ছাতেই দূরত্ব বাড়িয়েছেন এবং খুব সহসা যেন ভুলেও গেছেন যে আরও একজন নারীর স্বামী তিনি। ভুলে গেছেন যে আরও একজন নারী অপেক্ষায় প্রহর গোণে তার জন্যে। নতুন স্ত্রী-কে নিয়ে হানিমুনে যাওয়া, নতুন একটি সন্তানের পিতা হওয়া, নতুন করে সংস্যার গোছানো...কি ভীষণ ব্যস্ত নব বিবাহিত দম্পতি। অতীতের কথা মনে করবার সময় তাদের কোথায়!

প্রথম প্রথম একটা বছর সবাই ভীষণ খেয়াল রেখেছিল তাঁর। সংস্যারটা তখনও তাঁরই হাতে ছিল। খুব ধীরে ধীরে যখন নিজেকে মানিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছিলেন তিনি, তখনই একদিন তার ভাগ্যে নির্ধারিত হলো যাবজ্জীবন কারানিবাস। দোতলায় সোনিয়ার কামরাটি হলো তাঁর কারাগ্যার, আর তিনতলায় তাঁর ভীষণ যত্নে সাজানো শোবার ঘরটি হলো সোনিয়ার রাজত্ব। এবং সাথে যেন রুদ্র এবং সুমিও। এমনকী এখনও সন্তানেরা তাঁর ঘরে এলে ভ্রূ কুঁচকে ওঠে রুদ্রর বারার।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শ্বাশুড়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন রাজিয়া বেগম। এককালে শ্বাশুড়ীই ছিলেন তাঁর সবচাইতে বড় আশ্রয়। ১৪ বছর বয়স থেকে এই

নারীর হাত ধরেই তো তিনি জীবন চিনতে শিখেছিলেন। আর এখন বদলে যাওয়া দিনের বিন্যাসে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে মমতা ভরা সেই হাত। কালের স্রোত বুঝি সম্পর্ক আর ভালোবাস্যার বুনোটকেও আলগা করে দেয়।

আগে যেমন তাকে ঘিরেই বসতো সকালের নাশতার আসর, এখন তো সেরকম হবার প্রশ্নই ওঠে না। কে আছে তার আপনজন? কেউ না। দাবার ছকে রানীর চেহারাটা বদলের সাথে সাথে বদলে গেছে সেনাবাহিনীর আনুগত্যও। ভীষণ ধীরগতির সেই পরিবর্তন সবার চোখ এড়িয়ে গেলেও, তাঁর যায়নি। এ বাড়িতে হাওয়ার দিক বদলকে যে তিনি সমস্ত অস্তিত্বের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুভব করেছেন!

তবু কখনও কখনও সবার সাথে নাশতার আসরে বসেন তিনি। যতটা না বলেন, তার চাইতে অনেক বেশি শোনেন। মেজ বউ ছাড়া আর কেউ তাকে তেমন গুরুত্ব দেয় না, জড় পদার্থের আচরণ করে। তবুও কীভাবে যেন এ সবের মাঝেই কিছু সময়ের জন্যে নিজেকে সজীব অনুভব করতে পারেন। মনে হয় যে বেঁচে আছেন, সংসারে আছেন!

এ সবের মাঝেও তার দৃষ্টি যেতে ভুল হয় না নীরার দিকে। শ্বাশুড়ী সামনে থাকায় মেয়েটা একদম গুটিয়ে আছে শামুকের মতোন। এবং শ্বাশুড়ীর হুকুম তামিল করতেই সদা ব্যতিব্যস্ত সে। নানান রকম সাংসারিক আলাপ, নতুন শাড়ির গল্প, বাচ্চাদের স্কুলের সমস্যা, কাজের বুয়ার বেয়াদবি, স্বামীদের সুনাম-বদনাম, পাশের বাড়ি কিংবা আত্মীয় মহলের রসালো কেচ্ছা-কাহিনী! না জানি কত হাজার রকমের বাক্য বিনিময় চারপাশে। তবুও কেন যেন তাঁর মনে হয়, এ সমস্ত আলাপ যেমন তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না; তেমনি নীরাকেও স্পর্শ করে না এতটুকু। এ সংসারে বোধহয় শুধু তাঁর শরীরটা থাকে, সে নয়।

অন্যেরা নিজেদের কেচ্ছা-কাহিনীতে মশগুল হলেও, মেজ বউ নয়। সে কথা বলছে তাঁরই সাথে। যদিও কিছু কথা রাজিয়া বেগম শোনেন, আর কিছু শোনেন না। সবকিছুই কেমন যেন তাঁকে পাশ কাটিয়ে যায়।

...বড় ভাবী, এটা কিন্তু তোমার অন্যায়। আর সবাইকে না হয় করলে, আমাকে কেন বঞ্চিত করো? কতদিন পর আজ নিচে নামলে তুমি?'

একটু কাষ্ঠ হাসেন রাজিয়া বেগম, 'আমি না হয় নামি না। অন্য কেউ-ও তো যায় না আমার ঘরে।'

'আর কারও কথা জানি না, আমি তো যাই। যাই না, বলো? আবার প্রায় সময়ই দেখি তুমি জায়নামাযে–নামায কিংবা কুরআন পড়ো। তখন বিরক্ত করতে সাহস পাই না।' এটুকু বলতে গিয়ে কেমন যেন হয়ে যায় মেজ বউ। রাজিয়া বেগম লক্ষ্য করেন। একটা হাত রাখেন তিনি মেজ বউয়ের হাতে। ভালোবাস্যার স্পর্শ!

...এ বাড়িতে যখন বউ হয়ে আসি আমি, তোমার হাত ধরেই তো এসেছিলাম, ভাবী। সবার বিরুদ্ধে গিয়ে বড় ভাই'র কাছ থেকে আমাকে পড়াশোনার অনুমতি নিয়ে

দিয়েছো তুমি। আজ আমি যে শিক্ষক হিসেবে সমাজ থেকে সম্মান পাই, সবই তো তোমার দান, ভাবী। এ বাড়ির প্রত্যেকটা মানুষ তোমার আঁচলের আশ্রয়ে থেকেছে, অথচ প্রয়োজনের সময় কেউ তোমাকে এতটুকু ছায়া দিতে পারেনি। আমিও পারিনি, ভাবী!...'

'কি যে ফালতু প্যাচাল পারো না, মেজ ভাবী।' হাত ভরা চুড়ির ঝংকার তুলে বিরক্ত প্রকাশ করেন জাহানারা বেগম। নীরার শ্বাশুড়ী। 'তোমাদের সর্বক্ষণ খালি জ্ঞানের কথা।'

'কি করবে, জাহানারা? যে পড়াশোনা শিখেছে, জ্ঞান তো তার থাকবেই। সবাই তো আর তোমার মত না যে বিয়ের পর পড়াশোনার নামটাও ভুলে যাবে!'

জবাব দেন না জাহানারা। বিষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন সেঝ বউয়ের দিকে। রাজিয়া বেগম জানেন যে সেঝ বউও তার কাছে আসবার প্রাণপণ চেষ্টা করে। কিন্তু সোনিয়ার ভয়ে পারে না। সংসারের সমস্ত ক্ষমতা রুদ্রের বাবার হাতে বলেই আর্থিক কারণে সেঝ বউকে সোনিয়ার ওপর নির্ভর করে থাকতে হয়। এ বাড়ির মানুষগুলো ভীষণ দুর্বল। আলহ্বজ ফোরকান উদ্দীন আহমেদ নামের মানুষটার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সাহস কারোর নেই।

'বড় বউ!' গম্ভীর কণ্ঠে ডাকেন সুফিয়া খানম। 'রুদ্রের বিয়ের কথাবার্তা চলতেছে, শুনছো তো?'

'কেমন করে, মা? আমাকে তো কেউ বলে নাই।'

'তাইলে এখন শুনো, রুদ্রের বাপ ঠিক করছে ছেলেরে বিয়ে করাবে। স্যারাদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে, গান-টান নাকি গায়–ওইরকম ছেলেরে মানুষ করার অন্য রাস্তা নাই।'

'আমার তো রুদ্রের গান ভালোই লাগে।'

'তা না হয় ভালো। কিন্তু গান দিয়ে পেট ভরে?' একটু যেন নরম হয় সুফিয়া বেগমের কণ্ঠ, 'দেখো বড় বউ, ছেলে বড় হইছে। বাপ-চাচার ব্যবসা সে না করলে, কে করবে? "নতুন বউ"র ছেলে বড় হইতে তো দেরি আছে...'

নতুন বউ'র ছেলে? ভীষণ বিস্মিত হন রাজিয়া বেগম? সোনিয়া কি আবার প্রেগনেন্ট? ছেলে হবে?

'আমি বুঝতে পারলাম না, মা।' কিছুটা সংকোচ করে বলেই ফেলেন তিনি। 'সোনিয়ার আবার বাচ্চা হবে?'

'আল্লাহর রহমতে ছেলেই হবে গো, মা। হাজী বাড়ির পীর সাহেব বলছেন। আজমীর শরীফে মানতও করছে রুদ্রের বাপ। এইবার বংশে আরেকজন বাত্তি আসবেই!'

একে একে সবার মুখের দিকে তাকান রাজিয়া বেগম। 'এত বড় একটা কথা...আমাকে কেউ বলে নাই! কেন? ভয় পেয়েছে আমি সোনিয়াকে অভিশাপ দিবো?'

ধরা পড়ে যাওয়া অপরাধীর মতো করে হাসেন সুফিয়া খানম।

'মন থেইকে তো আর ইচ্ছা কইরে বদদোআ দিবা না, মা। সেইটা তো আমি জানি। কিন্তু মনরে কি করবা? দিল থেইকা তো বদদোআ আসতেই পারে।...নতুন বউ পোয়াতী মানুষ। তারে এইবার মাফ-সাফ কইরে দাও গো, মা। সে তোমার ছোট বুনের মতো।'

'বোন কি সতীন হয়, মা?' মনে মনেই প্রশ্ন করে মূক আত্মাটি তাঁর। শ্বাশুড়ী রূপী প্রিয় মানুষটির আলোকিত মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বাড়াতে ইচ্ছা হয় না। কি লাভ বাড়িয়ে?

'রুদ্রের বাপেরেও অন্তর থেইকে মাফ কইরো, মা। স্ত্রী মাফ না করলে পুরুষ মানুষ বেহেশ্‌ত পাইবে না। হাদিসের কথা বহুত বছর তো রাগ অভিমান হইলো। এখন দুই বুন মিলেমিশে সংস্যার করো। তুমি বয়সে বড়, তুমিই আগে তার সাথে মিল দিবা। কত গয়না তোমার! নতুন বউরে কয়টা দিলেই পারো। তুমি তো আর ওইসব পরো না!'

কোন গহনার কথা বলা হচ্ছে, সহজেই বুঝতে পারেন রাজিয়া বেগম। নানী, মা আর শ্বশুড় বাড়ির সূত্র ধরে প্রায় দেড়শো ভরি সোনার মালিক তিনি। সে আমলে এটা এমন কোনো বড় ব্যাপার ছিল না। তবে এখন হয়তো বড়। কিন্তু অর্থের হিসাবে নয়, তাঁর কাছে গহনাগুলি মূল্যবান স্মৃতির হিসাবে। কত যে অযুত-নিযুত স্মৃতি সেগুন কাঠের সেই বাক্সটার দৃঢ়তায় বন্দী, তা শুধু তিনি একাই জানেন। আর সেইসব স্মৃতি জগতের কারও সাথেই ভাগাভাগি করে নেয়া সম্ভব নয়!

তবুও মুখ ফুটে কিছুই বলেন না তিনি। শ্বাশুড়ীর এতগুলো বাক্যের বিনিময়ে নীরবতাই দিতে পারেন শুধু। সকলে হয়তো তাঁর এ নীরবতাকে নীরব সম্মতিই ধরে নেয়। কে জানে, একদিন হয়তো তিনি সেগুন কাঠের বাক্সটায় বন্দী স্মৃতিগুলোও সোনিয়া নামের বিজয়ী নারীকে দিয়ে দিবেন। স্বামী দিয়েছেন, সংস্যার দিয়েছেন, আপনজনদের ভালোবাসা দিয়েছেন...গহনা তো ভীষণ তুচ্ছ বস্তু!

দশ.

'বলেছিলাম আমাকে বিয়ে কর্। তা তো করলি না। এখন দেখ্, কেমন লাগে!'

'ধ্যাৎ, সবুজ। ফাজলামি করবি না। আমি সিরিয়াস।'

'আমিও সিরিয়াস। বাপ-মা বিয়ে দিতে চাইলো, আর তুই নাচতে নাচতে বিয়ে করলি। বলি, পাত্র হিসেবে আমি খারাপটা কোথায় ছিলাম?'

'আবার শুরু করলি যাচ্ছেতাই বলা?'

'আচ্ছা যা, বলবো না। যদি না বলি, কি উপকারটা হবে? রুদ্র ভাই বিদ্রোহ না করলে তোর সমস্যার সমাধান হবে না। রুদ্র ভাই বিদ্রোহ করবে, বিদ্রোহে জিতবে, সাহস করে তোর হাত ধরবে–তাহলে হয়তো সুখ আসতে পারে তোর জীবনে। অনেক

দূরের ব্যাপার। দিল্লী অনেক দূর!'

'এমন সিরিয়াস একটা ব্যাপার নিয়েও তুই ঠাট্টা করছিস?'

'নয়তো আর কি করবো? তোর জীবনটাই তো একটা রসিকতাই। স্বামী নামের একটা বস্তু আছে, আবার ভালোবাস্যার একজন পুরুষ...'

এ পর্যন্ত শোনার পর আস্তে করে মোবাইল ফোনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে নীরা। করতে বাধ্য হয়। কেননা গোসল সেরে বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসে রাসেল। গতরাতেও সে ফেরেনি, মেজাজ এ কারণেই ফুরফুরে।

এ মানুষটাও রুদ্রের মতোই রূপবান। হয়তোবা বেশি। মাতাল অবস্থায় ছাড়া এমনিতে যথেষ্ট ভদ্র-নম্র মানুষ। নীরার সাথে তখন আচরণও খারাপ নয়; যতক্ষণ পর্যন্ত না বাবা-মা তাকে চাপাচাপি করে বউকে সময় দেয়ার জন্য, সংস্যারী হবার জন্যে।

নীরবে ভেজা তোয়ালে সরিয়ে নেয় নীরা। বিছানায় সাজিয়ে রাখা পোশাক গুলো এগিয়ে দেয়। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তৈরি হয় মানুষটা। নীরা তার অনিচ্ছার বউ। প্রথম প্রথম মানিয়ে চলার চেষ্টা সে যথেষ্টই করেছিল। কিন্তু ভালোবাস্যার মেয়েটিকে ভুলতে পারেনি। নীরা শুনেছে, আজকাল রাসেল সেই মেয়েটিকে নিয়েই থাকে। সম্ভবত বিয়েও করেছে তারা। বনানীতে আলিশান এক ফ্ল্যাটে চমৎকার সংস্যার আছে তাদের।

'দুপুরে খেয়ে যাবো আব্বু-আম্মুর সাথে। রাতে ফিরবো না।'

'ঠিক আছে।'

'তোমার কিছু লাগবে? টাকা-পয়সা?'

'উহুঁ!'

'তারপরেও আলমারীতে থাকলো। লাগলে খরচ কোরো।'

'ঠিক আছে।'

'আচ্ছা নীরা, আম্মু তোমাকে আমার ব্যাপারে প্রশ্ন করে না? রাতে কোথায় থাকি, এ ব্যাপারে?'

'নাহ্!'

'তোমার জানতে ইচ্ছা হয় না?'

'কি করবো জেনে? তাছাড়া তোমার ব্যাপারে কথা বলতে ভয়-ও লাগে। মদ খেলে তুমি তো আর মানুষ থাকো না। আমি জানি, আমাদের জীবন এভাবেই চলবে। বাড়ির অন্যেরাও জানে।'

'কি বলছো!'

'তাদের কাছ থেকেই তো আমি শুনেছি লুনার খবর, তোমার নতুন সংসারের খবর।'

'তাহলে তো ভালোই। আমার আর কাউকে বলতে হবে না।'

চলে যায় রাসেল, বাবা-মায়ের সাথে দেখা করতে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেরে চুপ করে থাকে নীরা। এ বাড়ির সবাই বুঝে গেছে যে রাজিয়া বেগমের মতোন সে-ও

পরিত্যাক্ত এক নারী। শুধু এটুকুই পার্থক্য যে রাজিয়া বেগম সংস্যার জীবনের ২৫টা বছর পার করবার পর পরিত্যাক্ত হয়েছেন। আর সে পরিত্যাক্ত হয়েছে মাত্র ছ'মাসে। তারা দুজনই এ বাড়ির সাজ-সজ্জার অংশ বিশেষ শুধু। এ বংশের বউয়েরা ঘর ছেড়ে যায় না, সেই মিথ্যা দম্ভের ইশারায় নাচতে থাকা কাঠের পুতুল!

এগারো.

রুদ্রের দিনগুলো এলোমেলো কাটে। ভীষণ!

মনটা কোথাও স্থির হয় না। শুধু যখন নীরা থাকে পাশে...অথচ মনের আঙিনা থেকে মুছে যায় না লিজার ছায়াও। গানকে ভালোবেসে একটা জীবন ব্যয় করেছে সে, অথচ স্বপ্ন শিখরকে ছুঁতে পারার কোনো সম্ভাবনা চোখে পড়ে না। শুনতে পেয়েছে "ম্যাডাম" আবার সন্তান সম্ভবা। শুনতে পেয়েছে, বাবা নাকি রুদ্র নামের বেড়ালের গলায় ঘণ্টি বাঁধার তোড়জোড় করছেন। মেয়েও ফাইনাল হয়ে গেছে। দারুণ রূপসী এবং আলহ্বাজ ফোরকান উদ্দীন আহমেদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুর একমাত্র কন্যা।

সবমিলিয়ে দুর্বিসহ জীবনটাকে আজকাল ক্রমশ অসহ্য মনে হয় রুদ্রের! দাদীর কোলে মাথাটা রেখেই পাশ ফেরে সে আদুরে ভঙ্গিতে। দাদীর নানান রকম কথাবার্তা এক কান ঢুকিয়ে অন্য কান দিয়ে বের করে দেয়। কতদিন পর দাদীর কোলে মাথা রাখা...একটু আয়েশ করা যাক!

'অ্যাই যে! বদমাইস।...ঘুমায় গেলি?'

'না না। ঘুমাইনি, দাদা। তুমি বলো।'

'তুই বল্, বিয়েটা করবি না?...অ্যাই, ঘুমাচ্ছিস ক্যান?'

'না তো। মোটেও ঘুমাই না, দাদা।'

'তুই তাইলে বিয়েতে রাজি?'

'মাথা খারাপ তোমার? আমাকে কে বিয়ে করবে?'

'সেইটা আমরা বুঝবো। তুই খালি রাজি হ।'

সুন্দর সময়টা শেষ। অগ্যতা উঠে বসে দাদীর চোখে চোখ রাখে রুদ্র।

'বাবা চায় আমি বিয়ে করি?'

'অবশ্যই চায়।'

'তাহলে তো আমি কোনোদিনও বিয়ে করবো না, দাদা।'

'এইসব কি বলিস আবোল-তাবোল?'

'দাদা, সব জেনেও না জানার ভান করবে না তো! তুমি ভালোই জানো, কেন বাবার কোনো ইচ্ছা পূরণ করবো না আমি।'

রুদ্রের মাথায় হাত বুলিয়ে কাছে টানার চেষ্টা করেন সুফিয়া খানম।

'আর কতদিন রাগ কইরে থাকবি, ব্যাটা? তোর মা-ও বুঝে না, তুই-ই বুঝিস না। তুই বড় হইছিস এখন, তোর বাপেরও বয়স হইছে। এইসব জেদাজেদি এখন ছাড়্,

বাপ।'

'তুমিও এখন ওদের দলের মানুষ, দাদা? বাবার ওকালতি করছো?'

'নারে, ব্যাটা! আমারে ভুল বুঝিস না। তোরা আমারে "দাদী" না ডাইকে "দাদা" ডাকিস। মৃত্যুর আগে তোর এই দাদার কয়টা দ্বায়িত্ব আছে না? আমি সেইটাই করতেছি। সংস্যারটাকে আমি আবার একসাথে দেখতে চাই।'

'একসাথে মানে কি, দাদা? ম্যাডাম সোনিয়ার তাবেদারি করা? নাকি ফোরকান উদ্দীন সাহেবের হুকুমে ঘাড় নাড়ানো?...পুত্র স্নেহে অন্ধ হয়ে গেছো তুমি, দাদা। নিজের ছেলের স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই ভাবছো না।'

'এইটা সত্য না।'

'এটাই সত্য, দাদা। শেষ পর্যন্ত তুমিও আমাদের ছেড়ে গেছো! অথচ আমার ধারণা ছিল মা-কে এবাড়িতে সবচাইতে বেশি ভালো তুমিই বাসো।'

'এখনও বাসি রে, বাপ। ভালোবাসি বললেই তো সবাইরে ক্ষমা-ঘেন্না কইরে দিতে বলি। সে স্বামী হারাইছে, আমিও তো স্বামী হারাইছি। তার কষ্ট তো আমি বুঝি।'

'তুমি স্বামী হারিয়েছো মৃত্যুর সামনে, দাদা। আর মা হারিয়েছে সতীনের কারণে। পার্থক্যটা অনেক বেশি!'

এবার আর জবাব আসে না। অপর পক্ষ থেকে। ধীর পায়ে চলে যান সুফিয়া খানম। এবং প্রায় সাথে সাথেই প্রবেশ করে নীরা। যেন অপেক্ষায় ছিল।

'দাদী কিন্তু খুব একটা ভুল বলেনি। ওনার দৃষ্টিকোণ থেকে যেটা সঠিক, সেটাই বলেছে। পৃথিবীতে এটা জরুরী না যে সবার দৃষ্টি ভঙ্গি একরকম হবে।'

'তুমি শুনছিলে সব? বাজে মেয়ে! শয়তান!'

'এ ব্যাপারে আমার নিজেরও কোনো সন্দেহ নেই।'

নীরার কোলে মাথা গুঁজে আবার শুয়ে পড়ে রুদ্র, 'চুলগুলো টেনে দাও একটু। আমি আরাম করে ঘুমাই।'

'ঘুমালে সব সমস্যার সমাধান হবে?'

'এসব সমস্যার সমাধান আমি শত চেষ্টা করলেও হবে না। কোনোও দিন না।'

'চেষ্টা করার আগেই আশা ছাড়ো কেন?'

'আমি ঠিক করেছি পালিয়ে যাবো।'

'কাপুরুষ!'

'হ্যাঁ, কাপুরুষই! অন্তত এই সংসারের যন্ত্রণা থেকে তো মুক্তি পাবো।'

'আর আমার কি হবে?'

'তুমিও যাবে আমার সাথে। যাবে না?'

'আমাকে নিয়ে গেলে কি উপকার হবে?'

'তোমার মতো করে এই আমাকে কেউ ভালোবাসতে পারবে না, নীরা।'

'আর তুমি? তুমি ভালোবাসো না আমাকে?'

'বাসবো না কেন, বাসি।'

'সত্যি ভালোবাসো?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রুদ্র। 'আমি জানি না। জানলে বলতাম।'

রুদ্রের কথার জবাবে শুধু কয়েক মুহূর্তের জন্যে থমকে যায় নীরার হাত।

বারো.

আজ সকালে নাকি রুদ্রের সাথে ওর বাবার ভীষণ ঝগড়া হয়েছে। তিনি অবশ্য দেখেননি, শুনেছেন মাত্র। জীবনে প্রথমবার সম্ভবত বাবার সাথে এতটা উচ্চস্বরে কথা বললো সে...সম্ভবত এ বাড়ির ইতিহাসেই এ প্রথম ফোরকান উদ্দীন আহমেদ নামক মানুষটার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো কেউ!

খুব সন্তপর্ণে চোখের কোনে জমানো অশ্রু মোছেন রাজিয়া বেগম। যদিও এ বাড়িতে তাঁর অশ্রু দেখবার মতো কেউ নেই। বাবার সাথে ঝগড়ার পর রুদ্রও নিরুদ্দেশ, আর বাবা শয্যাশায়ী।

এটাও অবশ্য তিনি শুধু শুনেছেনই মাত্র। তিনতলায় তাঁর মত অচ্ছ্যুৎ মানুষের প্রবেশাধিকার নেই। মন হাজার বার চাইলেও অনুমতি নেই রুদ্রের বাবাকে একনজর দেখতে পাওয়ার। তিনি শুধু বিধাতার সামনে প্রার্থনা করতে পারেন প্রিয় মানুষটির মঙ্গল কামনায়।

ধীরে ধীরে পুরনো আমলের কাঠের আলমারিটা খোলেন রাজিয়া বেগম। প্রথম বিবাহ বার্ষিকীতে শ্বশুড় সাহেব উপহার দিয়েছিলেন। আলমারিটা বুকে ধারণ করে আছে তার বিবাহিত জীবনের প্রায় পুরো ইতিহাসই। এজন্যই হয়তো রুদ্রের বাবার দয়া হয়েছিল তাঁকে! দোতলায় ফেলে দেয়ার সময়ে কাপড়-চোপড় সমেত এটাকেও পাঠিয়ে দিয়েছিলেন নিচে।

এককোণে ঝুলিয়ে রাখা শুভ্র একটা শার্টকে টেনে নেন রাজিয়া বেগম। জড়িয়ে রাখেন দীর্ঘসময়। রুদ্রের বাবার খুব পছন্দের শার্ট ছিল এটা। কীভাবে কীভাবে যেন তাঁর শাড়ির সাথে মিলেমিশে আলমারির এক কোণে রয়ে গেছিল...রুদ্রের বাবার একমাত্র চিহ্ন হয়ে।

বিগত ১১টা বছর এই শার্টটিকে বুকে জড়িয়েই তো তিনি বেঁচে আছেন! প্রায় প্রতিদিনই শার্টটিকে আগলে ধরে ফিরে পেতে চেষ্টা করেন হারানো মানুষটির এতটুকু ঘ্রান। একা একাই কাঁদেন মনে করে পুরনো দিনের কথা। এই তো সম্বল তাঁর জীবনের–পুরনো স্মৃতি, পুরনো শার্ট, আর...পুরনো ক্ষতচিহ্ন।

কি যে হয় আজ, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ডান বাহুর ক্ষতচিহ্নটাকেও অনুভব করেন দীর্ঘসময়। ভাইয়ের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন তিনি। ফিরে এসে দেখেন দোতলায় কারাগ্যার নির্ধারিত হয়ে গেছে তার জন্যে। অনুপস্থিতির সুযোগে নির্বাসিত হয়েছেন তিনি আজীবনের দন্ডে। সে সময়ে তিনি বিরোধিতাও করেছিলেন অবশ্যই।

অনর্থক বিরোধিতা। প্রাপ্তি শুধু ছিল বাহুর এই ক্ষতচিহ্নটি রুদ্রের বাবার দেয়া উপহার!

জীবন এত নিষ্ঠুর কেন? নাকি শুধুমাত্র তাঁর সাথেই নিষ্ঠুর?

তিনি জানেন না। এখন আর জানতে চান-ও না। শুধু জানেন, তাঁর এই কারা জীবনের অবসান হবে শুধুমাত্র মৃত্যুতে। পূর্বে নয় কোনোমতেই।

...বহুবছর পর শিশুদের মত ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে থাকেন রাজিয়া বেগম। তাঁর অশ্রুতে ক্রমশ ভিজে যায় শুভ্র শার্টটি। প্রিয় মানুষটার পুরনো পোশাকটিই শুধু ভেজে; মানুষটি নয়।

এবং না জানি কত অনন্তকাল পর...

দরজায় শব্দ হয়। এরপর নীরার সাবধানী পায়ের আওয়াজ। যদিও ফিরে তাকান না রাজিয়া বেগম। নিজের অশ্রু তিনি কারোর সাথেই বিনিময় করেন না।

'কি দরকার?' রীতিমত ধমকে ওঠেন। রূঢ় কণ্ঠে।

জবাব আসে না।

'কোনো কথা না থাকলে দাঁড়িয়ে থাকবানা বেকুবের মতো। যাও!'

এবারও নিশ্চুপ মেয়েটা।

'সমস্যা কি? বললাম না যাও!...'

নীরার মুখের দিকে তাকিয়ে থমকে যান রাজিয়া বেগম। মুখটা ফ্যাকাশে, চোখ জোড়ায় একরাশ বিস্ময়, ঠোঁট দুটো কাঁপছে তিরতির করে!

'মামা...বড় মামা আপনাকে ডেকেছেন! তিন তলায়!'

রাজিয়া বেগমকে বরফে পরিণত করে যেন ঘোষণা করে নীরা।

তেরো.

খুব সাবধানে বিছানার এক কোণে বসেন তিনি, এগারো বছরের জমানো সমস্ত সংকোচ সাথে নিয়ে। একসময় এ ঘরটিই ছিল তাঁর একান্ত নিভৃত কোণ। তিনি ছড়িয়ে ছিলেন প্রতিটি বিন্দুতে। আর এখন...

কত কিছু বদলে গেছে! আবার বদলায়নি অনেক কিছুই। রুদ্রের দাদার আমলের কারুকার্য খচিত এই খাট। দীর্ঘ কালেও এতটুকু বির্বণ হয়নি সেগুন কাঠের জৌলুস। প্রায় রাতেই স্বামীকে তিনি বলতেন যে খাটটিকে তাঁর সমুদ্রের মতো লাগে। সেই খাটেই আধশোয়া এখন মানুষটা।

আছে দেয়ালে ঝোলানো সাদা-কালো ছবিটাও। তাঁরা দুজন সমুদ্রের ফেনায় পা ভিজিয়ে, কোলে তিন বছর বয়সী প্রথম সন্তান। সেই প্রথম তাঁর সমুদ্র দেখা। কি ভয়টাই না পেয়েছিলেন বিশাল ঢেউগুলো দেখে!

...নাহ্, আর কিছু নেই। অবশ্য থাকবার কথাও তো নয়। অত্যাধুনিক আসবাবে সজ্জিত এই ঘরে ভীষণ রকম বেমানান এখন তিনি। ভীষণ রকম পুরনো আর বির্বণ! অন্য নারীর শোবার ঘরে...

একটা সময় ছিল–যখন পর নারীর স্বামী পুরুষটি তাঁর জীবন সঙ্গী ছিল। মানুষটা ভালোবাসতো তাকে, সম্মান দিতো। মানুষটাকে ঘিরেই তো ছিল তাঁর সম্পূর্ণ পৃথিবী। সেই মানুষ, যে আদর করে তাঁকে ডাকতো...

'বউ!'

কে ডাকলো? তাঁর কল্পনা? নাকি...

'তুমি অনেক রোগা হয়ে গেছো, বউ!'

দীর্ঘ দীর্ঘ অনেক মুহূর্ত চুপ করে থাকেন রাজিয়া বেগম। কি আশ্চর্য সংকোচ! কত সহস্র-লক্ষ কথা আছে বলবার মতো। অথচ কিছু বলতেই এতটুকু ইচ্ছা হচ্ছে না।

'আপনার শরীর খারাপ। কথা বলে কাজ নাই।'

'তুমি আমার ওপর এখনও রাগ করে আছো, না?'

জবাব দেন না রাজিয়া বেগম, মানুষটার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন শুধু। কতকাল বাদে এত কাছ থেকে দেখছেন!

'বলো বউ, কথা বলো! তুমি রাগ করে আছো না?'

'থাকলেই বা কি!'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন ফোরকান উদ্দীন সাহেব। 'হ্যাঁ...থাকলেই বা কি! সময় তোমাকে-আমাকে কত দূরে নিয়ে গেছে। কিন্তু বউ, তোমাকে আমি কোনোদিন ভুলি নি। আমার বাচ্চাদের মা তুমি! তুমি যদি আমাকে মাফ না করো...'

'এতকাল পরে এইসব কথার কি লাভ?'

'আমি জানি, বউ। অনেক দেরি হয়ে গেছে। তবুও...তুমি পারলে আমাকে মাফ করে দিও। ভুল না, আমার কাজকে পাপ মনে করেই মাফ করে দিও। তুমি মাফ না করলে আমি শান্তিতে মরতেও পারবো না!'

'ছিঃ! মৃত্যুর কথা ভাবেন কেন?'

'ভাবতে তো হয়ই। জীবন আর কয়দিনের বলো?...তোমাকে একটা অনুরোধ করি, বউ। রাখবে??'

'আপনি বলেন।'

'আমি চাই রুদ্র সংস্যারী হোক। বাপের ওপর রাগ করে ছেলেটা বাউণ্ডুলে হয়ে গেলো। আমি ভুল করেছি, শাস্তি আমার হবে। সে নিজেকে কেন শাস্তি দেয়? আমি চাই এবার তাকে একটা বিয়ে দিতে।'

'আপনার ছেলে, ইচ্ছা হলে বিয়ে দিবেন।'

'না বউ, শুধু আমার ইচ্ছায় হবে না। শুধু নামেই আমার ছেলে রুদ্র। তুমি ছাড়া আর কারও কথা সে শুনবে না।...তুমি একবার তাকে বলবে, বউ?'

'আচ্ছা, ঠিক আছে। বলবো।'

'আরও একটা কথা...'

'বলেন!'

'এই সংস্যার তো তোমারও। বলো, তোমার না?'

'একসময় ছিল!'

'এটা তোমার ভুল ধারণা। এই সংস্যার এখনও তোমারই আছে। তুমি শুধু আবার সংসারে ফেরত এসো।'

এসব কি শুনছেন এতকাল পর? রাজিয়া বেগম নিজের অস্তিত্বকেই বিশ্বাস করতে পারেন না। ১১টা অসহনীয় বছরের প্রতিটি মুহূর্ত এ দিনের অপেক্ষাই তো তিনি করেছেন।

সত্যি? না স্বপ্ন?

স্বপ্ন যে নয় তা বিশ্বাস হয় তখন, যখন তাঁর জীর্ণ-শীর্ণ একটা হাত নিজের কাছে টেনে নেন ফোরকান উদ্দীন সাহেব।

'তুমি এগারোটা বছর আমার সাথে নিজে থেকে কথা বলোনি, বউ। ঈদের দিন পর্যন্ত একবার দেখা করোনি। আমি নিজে দেখা করেছি।'

'আপনিও তো আমাকে ডাকেন নাই। বছরে একদিন খোঁজ নিয়েছেন।'

'আমার শেষ একটা কথা রাখবে, বউ? শেষ একটা কথা।'

'বলেন...'

'এইখানে একটা সই করো। বাড়ির কাগজপত্র।'

ভীষণ বিস্ময় নিয়ে কাগজগুলোর দিকে চেয়ে থাকেন রাজিয়া বেগম। খুব স্বল্প শিক্ষিত তিনি। তবু বুঝতে অসুবিধা হয় না কিছুই। এ বাড়িটা এতকাল তাঁর নামে ছিল। একটি সইয়ের পর হয়তো হবে মিসেস সোনিয়া আহমেদের।

'আমাকে এত অবিশ্বাস করেন আপনি?'

বিব্রত মনে হয় মানুষটাকে। 'না, অবিশ্বাস না। শুনছো তো, তোমার বোন আবার মা হচ্ছে। আলট্রাসোনোগ্রাফিতে বলেছে ছেলেই হবে। রুদ্র তো সোনিয়াকে সহ্য করতে পারে না। তাই সোনিয়ার ইচ্ছা...পোয়াতী মেয়েছেলে। মনে কষ্ট দিতে চাই না।'

'আর আমার কষ্ট? আমার কষ্টের কি?' বলেন তিনি মনে মনে, মুখে একটি শব্দও উচ্চারণ করেন না।

'তুমি রাগ কোরো না, বউ। আমার যা আছে, সবই তো তোমাদের। সোনিয়া তোমার বোনের মতন। তারেও এইবার মাফ করে দাও। নতুন ছেলে আসবে সংসারে। তাকে দুজন মিলেমিশে বড় করবে!'

এবারও কিছু বলেন না রাজিয়া বেগম। নিজের হাতটাকে ফিরিয়ে নেন শুধু। ঘেন্নায় সমস্ত শরীর রি রি করছে। না জানি কতদিন ধরে এই দিনের পরিকল্পনা করেছে মানুষটা। কাগজপত্র তৈরি করে সঠিক সময়ের অপেক্ষা করেছে। আর আজ...কি প্রয়োজন ছিল এত ছলনার?

বিনা দ্বিধায় সই করে দেন তিনি। সেই সাথে চলে যেতেও উদ্যত হন। তারপর

আবার কি হয়, ফিরে তাকান তিনি মানুষটার দিকে। হয়তো শেষ বারের মতোন।

'আপনার সন্তান হবে। খুব সুখের কথা। কিন্তু সেই সুখ আপনাদের কাছেই থাকুক। আমাকে করুণা করার প্রয়োজন নাই। সোনিয়া আমার বোন না, সতীন। স্যারাজীবন তাই-ই থাকবে। আর...আজকে থেকে আমি অস্বীকার করলাম যে আপনি আমার স্বামী। একজন ভণ্ড মানুষ কোনোদিন আমার স্বামী না। আজকের পর আমি আর কোনোদিন আসবো না আপনার সামনে। আপনার মৃত্যু হলেও না।'

কতগুলো কথা বলে ফেলেন। এগারো বছরে প্রথমবার!

এবং সে রাতেই দ্বিতীয় বারের মত স্ট্রোক করে আলহাজ ফোরকান উদ্দীন নামের মানুষটির। যদিও রাজিয়া বেগম সে সংবাদে বিচলিত হন না।

অসংখ্য বার প্রতারিত হতে হতে পাষাণে পরিণত হওয়া এক নারীর এমন সংবাদে বিচলিত হবার কোনো কারণ নেই।

কে হয় পুরুষটি তাঁর? কেউ না!

চোদ্দ.

স্থির হয়ে বসে আছেন তিনি জানালার ধারে। চোখজোড়া আকাশের বুকে; শূন্য, এলোমেলো দৃষ্টি। কিন্তু ভীষণ রকম শান্ত মুখের রেখাগুলো, দেহের গতিশীলতা। কেমন যেন ছায়ার মতো। যেন কিছুতেই আর কিছু যায় আসে না তাঁর। আশেপাশের নিদারুণ অস্থিরতার মাঝেও শান্ত তিনি; অতিরিক্ত স্থির।

খুব ধীরে ধীরে পাশে বসে নীরা। কথা বলে না। বলতে ইচ্ছাও হয় না। গতকাল সকাল থেকে যেন নরক ভেঙে পড়েছে এই বাড়িতে। সেই যে রুদ্র বেরিয়ে গেছে, এখন পর্যন্ত ফেরেনি। পাওয়া যায়নি কোনো খবর পর্যন্ত। মানুষটার কোনো মোবাইল ফোন নেই।

গতরাতে দ্বিতীয়বারের মতো স্ট্রোক করেছে বড় মামার। স্যারারাত বাড়ির প্রায় সবাই হাসপাতালে। এমন সময় রুদ্রের অন্তত থাকা উচিত ছিল। মানুষটা কোথায় আছে, কেমন আছে...চিন্তা করতে করতে একরাশ দুঃশ্চিন্তা আটকে থাকে নীরার বুকের মাঝে।

ভোর আসি আসি করছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাজিয়া বেগমের মতো নীরাও চেয়ে থাকে আকাশের বুকে। পাশের নারীর মতো সে-ও আজ অপাঙক্তেয় এ বাড়িতে। রাসেল যে আরেকটি বিয়ে করেছে, এ সংবাদ এখন সবাই জানে। স্বামী পরিত্যাক্তা সে আর এখন এ বাড়ির বউ নয়; আশ্রিতা।

নিজের অন্ধকার ভবিষ্যতের প্রতিটি বিন্দু যেন চোখের সামনেই দেখতে পায় নীরা। এ বাড়ির চার দেয়ালের মাঝে ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুই তার পরিণতি, ঠিক রাজিয়া বেগমের মতোন। তবু একটি বারও ইচ্ছা হয় না পালিয়ে যেতে। কক্ষনো হয় না।

কোথায় যাবে? রুদ্রকে ফেলে কোথায় যাবে সে? রুদ্র ছাড়া এ পৃথিবীতে কে আছে তার? কীভাবে থাকবে সে রুদ্রকে ছাড়া?

দুঃস্বপ্নের রাত্রি শেষ হবে একদিন–নীরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে। একদিন সবকিছু ঠিক করে দেবে রুদ্র। সবকিছু বদলে দেবে। তারা দুজনে মিলেমিশে নতুন করে ঘর বাঁধবে...স্বপ্নের ঘর; একজোড়া বাবুই পাখির মতো!

'কিছুই ঠিক হয় না!' যেন নীরার মনের কথা বুঝতে পারেন, এমনভাবে বলেন রাজিয়া বেগম। জীবনে প্রথম বারের মতো স্পর্শ করেন নীরাকে। 'শুধু-শুধু আশা করিস না, বোকা মেয়ে! আমিও তো এগারো বছর আশাই করে থাকলাম।'

কি যে হয়, একটু খানি আপন স্পর্শে চোখের মায়া ছেড়ে গড়িয়ে নামে অশ্রুরা। তবু চোখ মুছে হাস্যার চেষ্টা করে নীরা।

'আমি আশা করি না। কারোর কাছ থেকেই করি না।'

'করলে দুঃখই পাবি শুধু। আমাকে দেখ্। দেখে শিক্ষা নে।'

'কি পার্থক্য আপনার-আমার মাঝে? আপনি যা, আমিও তাই। এই বাড়ির ফার্ণিচার আমরা; কোনো পার্থক্য নেই। না হয় আমিও বেঁচে থাকবো আপনার মতো মিথ্যা আশা নিয়ে। কি আসে যায়?'

'আসে যায়, নীরা। রুদ্রের আসে যায়।'

এতটাই বিস্মিত হয় নীরা যে কাঁদতে ভুলে যায়। বিস্ময় নিয়ে চেয়ে থাকে শুধু।

,'রুদ্রকে ভালোবাসিস তুই। বাসিস না? রুদ্রও ভালোবাসে তোকে। জানি আমি।'

'সত্যি কি ভালোবাসে, মা?'

"মা" সম্বোধনটা যেন শুনেও শোনেন না রাজিয়া বেগম। কোমল একটা হাত বুলিয়ে দেন নীরার মাথায়।

'রুদ্র একদিন এই জেলখানা থেকে বের করে নিবে তোকে। তুই দেখিস!'

'সত্যি কি নিতে পারবে?'

'নিবেই। নিতে হবে।'

'সত্যি শেষ হবে এই দুঃস্বপ্ন?'

'হবে। তুই একটু সাহস রাখ। ভালোবাস্যার অসাধ্য কিছুই নাই।'

'রুদ্র কি ভালোবাসে আমাকে?'

'ওই ছেলে পেটে ধরছি আমি, নীরা। তার প্রত্যেকটা নিঃশ্বাস আমি চিনি। আমি জানি সে ভালোবাসে তোকে,

'কেন স্বপ্ন দেখাচ্ছেন, মা? স্বপ্ন কখনও সত্যি হয় না।'

'কে বলেছে সত্যি হয় না? আমার আশা পূরণ হয় নাই তো কি হলো। তোরটা হবে! আমার হাল দেখে হতাশ হবি না, নীরা। বরং সাহসী হ। রুদ্রকে নিজের করে নে।'

'নিজের করে নেবো? কাকে নিজের করে নেবো? যার নিজের কোনো পরিচয়

নেই। সে কীভাবে অন্যকে আপন করবে? কে আমি? কেউ না। কিচ্ছু না!'

'তোর বাবা-মায়ের সন্তান তুই।'

'সন্তান না, মা। বাবা-মায়ের মেয়ে আমি। কালো মেয়ে। ঘাড়ের বোঝা।'

'এই বাড়ির বউ তুই।'

'বউ? বউ নয়, আশ্রিতা।'

'রুদ্রের প্রেমিকা তুই।'

'প্রেমিকা?' ভীষণ ভীষণ মলিন হাসে নারী। অশ্রু গোপন করার অনর্থক চেষ্টাও আর করেনা।...রুদ্রের রক্ষিতা আমি, মা। রক্ষিতা! রুদ্র নামের এক পাষাণ পুরুষের চাহিদা মেটানোর নারী শরীর আমি। স্রেফ একটা শরীর। এমন এক পুরুষের রক্ষিতা আমি, যে আমার অসহায় জীবনের ফায়দা তোলে ভালোবাস্যার মিথ্যা প্রতিজ্ঞা করে। কারণ বিছানায় একটি নারী শরীরের প্রয়োজন হয় তার।...অবশ্য এখন থেকে আর সে প্রয়োজনও পড়বে না। কেননা আজকের রাতে তার পাশে আছে অন্য এক নারী। তার ভালোবাস্যার নারী...'

আর কিছু শুনতে পাননা রাজিয়া বেগম। সমস্ত শরীর কেন যেন জ্বালা করে ওঠে। কি যে হয়, সজোরে একটা চড় কষান নীরার গালে। সম্ভবত জীবনে প্রথম বারের মতো কারও গায়ে হাত তোলেন তিনি।

কিছুই বলে না নীরা। একটু প্রতিবাদ করে না। কোনো রকম আওয়াজ পর্যন্ত না। নীরবে উঠে চলে যেতে উদ্যত নয়।

'রুদ্রকে খবর দাও, নীরা।'

থমকে দাঁড়ায় মেয়েটা, তবে পেছন ফেরে না।

'আমি জানি না রুদ্র কোথায়।'

'একমাত্র তুমিই জানো! আর একমাত্র তুমিই পারবে তাকে বাসায় আনতে। আমার রুদ্রকে আমি ফেরত চাই, নীরা।'

জবাব দেয় না নীরা। চলে যায়। টুকরো টুকরো হওয়া মনটাকে চুর্ণ-বিচূর্ণ করে নিয়ে।

এ পৃথিবীতে আসলেই বোধহয় মানুষ নামের প্রাণীটার কোনো সত্যিকারের আপনজন নেই!

পনেরো.

গত রাতটাকে এখনও স্বপ্নই মনে হয় রুদ্রর। এমন এক স্বপ্ন, যার অপেক্ষা করেছিল তার সমগ্র অস্তিত্ব। ভালোবাস্যার মেয়েটি ছিল নিবিড় সান্নিধ্যে পুরো একটি রাতের বাহুডোরে। অবশেষে মিটে গেছে দূরত্ব! সত্যি কি মিটেছে?

কিছু সময়ের জন্যে হলেও নিজেকে কেমন যেন সুখী সুখী মনে হয় রুদ্রের। মনটাকে হালকা মনে হয় যেন এক টুকরো মেঘ। সুখের নরম আলো কেমন অবলীলায়

ছড়িয়ে পড়ে মনের অলিতে গলিতে।

লিজাকে অপলক দেখে রুদ্র।

ভেজা চুলের পানি গড়িয়ে নামছে ওর মসৃণ ত্বক বেয়ে গ্রীবার বারান্দায়। চোখের ঘন পাঁপড়িতে এখনও জমে আছে আর্দ্রতা। অসম্ভব সুন্দর চোখ জোড়া কেন যেন ভীষণ রকম ভাষাহীন এ মুহূর্তে। আর তিরতির করে কাঁপছে গোলাপী ঠোঁটেরা...

'ভুল হয়ে গেছে, রুদ্র। ভীষণ রকম ভুল!' না তাকিয়েই বলে মেয়েটা অসম্ভব অসম্ভব শান্ত কণ্ঠে। 'আমি...আমি বোধহয় খুব বেশি সিমপ্যাথেটিক হয়ে পড়েছিলাম!'

সিমপ্যাথেটিক? নিজেকে বিশ্বাস করে উঠতে পারে না রুদ্র। গতরাতের ভালোবাসা ছিল তবে সহানুভূতি ফলাফল? ঘরছাড়া, বাউণ্ডুলে রুদ্রের জন্য এক টুকরো করুণা?

'...বাড়িতে কেউ ছিল না। আর তুই এমন বিধ্বস্ত অবস্থায় এসে হাজির হয়েছিস! নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারিনি আমি। ভুলে গেছিলাম যে এসব আমার জীবন নয়। এখানে আমার জীবন নয়। আমি পুরোপুরি অন্য পৃথিবীর মানুষ!'

লিজাকে কাছে টেনে নেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে রুদ্র। 'জানি যে তোকে অনেক কষ্ট দিয়েছি আমি। এসব অভিমানের কথা আর নয়, লিজা। আমরা তো পরস্পরকে ভালোবাসি। না হয় একসাথে এবার নতুন জীবন শুরু করবো।'

'ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা কর্।' এবার রুদ্রের মুখোমুখি হয় লিজা, চোখে চোখ রাখে। 'এককালে হয়তো ভালোবাসতাম আমরা একে অন্যকে। হয়তো দুর্বলতাটা আজও আছে। তাই বলে জীবন কাটানো? তোর পাশে মানায় আমাকে? বাইরে সেটলড এখন আমি। আমার লাইফ স্টাইল, আমার এডুকেশন, সোসাইটি...সবকিছুর তুলনায় কত বিবর্ণ তুই। আই মীন, বন্ধুরাই তো হাসবে; যদি তোর মতো বাউণ্ডুলেকে প্রেমিক পরিচয় দেই আমি। নিজের পরিচয়, সোসাইটিতে স্ট্যাটাস–কি আছে তো? আমার লাইফ স্টাইল, আমার এডুকেশন...'

আর শুনতে পায় না রুদ্র। বাক্যগুলো মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌছায় না। শূন্য চোখে চেয়ে থাকে শুধু স্বপ্ন-পরীর অপরূপ চোখে। কি ভীষণ শীতলতা স্বপ্ন-মানবীর ধূসর চোখের তারায়...

রুদ্রের তখনও জানা নেই লিজার বারান্দায় বসে থাকা অতিথির খবর। রুদ্রের ভাবী পরিচয়ে যে মানুষটি তাকে নিয়ে যেতে এসেছে, তার অস্তিত্ব জুড়েও তখন ছিল শুধুই শীতলতা। চোখে নয়, হৃদয়ের গহীন গহীন তম বিন্দুতে।

হৃদয়ে তার নেমে আসছিল গাঢ় কালো অন্ধকার। মৃত্যুর মতো!

কিংবা ভালোবাস্যার মতো!

ষোলো.

কি ভীষণ অসহায় দেখাচ্ছে বাবাকে!

মুখে জুড়ে খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি, চোখের কোল জুড়ে ক্লান্তির গাঢ় রেখা। গভীর ঘুমে ধীর হয়ে এসেছে নিঃশ্বাসের ছন্দ। কেবিনটার এক কোণে বসে ক্রমাগত চোখ মুছছে সোনিয়া নামের সেই নারী।

কেন যেন ম্যাডামকেও এখন আগের মতো খারাপ লাগে না রুদ্রর। বাবার যখন ঘুম ভাঙে আর তাকে যত্ন করে পানি খাওয়ায় সেই মহিলা, তখন কেমন যেন তাকে একটু ভালোও লাগে। পুরুষটিকেও এ মুহূর্তে আর আলহাজ ফোরকান উদ্দীন মনে হয় না, স্রেফ বাবা মনে হয়। কত কত দিন পর!

রুদ্রের এখন আর একটি বারও মনে পড়ে না পিঞ্জিরা বন্দী সেই নারীর মুখ, যে ডানাকাটা কবুতরের মত ছটফট করে একটুকরো মুক্ত আকাশের প্রতীক্ষায়। যে প্রতীক্ষা করে সেই সন্তানের, যার নাম রুদ্র।

কাঁচের পার্টিশনটা স্পর্শ করে দাঁড়িয়ে থাকে রুদ্র, যেন কাঁচের ওপাশে বাবার অবয়বটাকে ছুঁয়ে দেখার চেষ্টা করে দূর থেকেই।

'যাও, নীরা। বাবাকে বলে এসো। বাবাকে বলো যে বিয়েটা করবো আমি।'

অসম্ভব কষ্টে ডানা ঝাপটায় নীরার চড়ুই পাখি মনটা, রক্তাক্ত দেহে মৃত্যু শয্যায় ছটফট করে। তবু রুদ্রের পাশেই ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে সে, যেন বিশ্বস্ত সৈনিক কোনো।

'বাবাকে বলবে, এখন থেকে ব্যবস্যার দেখবো আমি। উনি যা চান, সেই মতোই কাজ করবো। তাকে সুখী করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো।'

'কাকে শাস্তি দিতে চাও? নিজেকে?'

'আমি তো শাস্তিরই যোগ্য–তাই না?'

'আর যে মানুষটা তোমার পথ চেয়ে আছে? তোমার অপেক্ষায় বেঁচে আছে? তার কি হবে?'

'মা? তাঁর জীবন এতদিনও তো কেটেছে। যেভাবে কেটেছে, সেভাবেই কাটবে

'পালিয়ে যাচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে?'

'এতদিন পালিয়ে ছিলাম। এখন মুখোমুখি হতে যাচ্ছি।'

রুদ্রকে স্পর্শ করতে গিয়েও করে না নীরা। অন্য নারীর স্পর্শের পর প্রিয় পুরুষটিকে ভীষণ রকম পর মনে হয়।

'শুভ হোক তোমার নতুন জীবন, রুদ্র। শুভ হোক।'

কেন যেন বিষণ্ন ভঙ্গিতে হাসে রুদ্র, 'আমি দুঃখিত, নীরা।'

'কেন দুঃখিত? আমাকে টিস্যু পেপারের মতো ব্যবহার করেছো বলে?'

'হয়তো তুমি না থাকলে অন্য কাউকে করতাম লিজাকে ভুলে থাকবার জন্যে একটি নারী তখন ভীষণ প্রয়োজন ছিল আমার। তুমি চরম নিঃসঙ্গ ছিলে, আমি ফায়দা তুলেছি। জড়িয়ে যাবো একটা সম্পর্কে, কখনও ভাবিনি। তুমি আমাকে সম্পর্কে

জড়িয়েছো।'

'দোষ দিচ্ছো?'

'বলতে পারো তাই। একতরফা সম্পর্কে আমাকে জোর করে বেঁধে রেখেছো তুমি।'

'রাখিনি। রেখেছিলাম।'

'সম্ভব হলে আমাকে ক্ষমা কোরো, নীরা!'

শান্ত, স্নিগ্ধ ভঙ্গিতে হাসে কষ্টে বিবর্ণ তরুণী। 'সব অপরাধের কি ক্ষমা হয়, বল্টুর বাপ?'

সম্বোধনটা হয়তো একটা মুহূর্তের জন্য বিব্রত করে রুদ্রকে।

'তুমি জানো, তোমার শরীরটাকে কবে প্রথম ভালোবেসেছিলাম আমি? কবে নিজেকে সমর্পণ করেছিলাম তোমার কাছে?...যেদিন লিজা আমাকে জানিয়েছিল বয়ফ্রেন্ডের সাথে ওর ভালোবাসাবাসির কথা। সেই দিন।'

'নিজেকে শাস্তি? না লিজার প্রতি অভিমান?'

'হয়তো দুটোই। কিংবা হয়তো লিজাকে ভুলে থাকার ব্যর্থ চেষ্টা।'

রুদ্রের চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে থাকে মৃতপ্রায় চড়ুই পাখির মনটা নীরার। গাঢ় বিষাদে মলিন হয়ে আসে চঞ্চল চোখের তারা, ঠোঁটের কোণের হাসির মৃদু উজ্জ্বলতা।

এই পুরুষটি তাকে আর ভালোবাসবে না? আর কখনও তাকে গভীর আবেগে জড়িয়ে বুকের মাঝে টেনে নেবে না?...নীরার সমগ্র অস্তিত্ব যেন মৃত্যুর অপেক্ষায় একটি একটি নিঃশ্বাস গোনে! একটু খানি স্বস্তির জন্যে যেন বুকের খাঁচায় ছটফট করে ভালোবাস্যার পুরুষের জুতোর নিচে পিষে যাওয়া হৎপিণ্ড!

মনটা যেন মুহূর্তে পাষান হয়ে ওঠে, আর দুচোখ ভরা অশ্রুরাও। না, কাঁদে না নীরা। একটুও না। এক পলকে শূন্য হয়ে যাওয়া মিথ্যা স্বপ্নগুলোকে বুকে আগলে দাঁড়িয়ে থাকে শুধু, ফেলে আর দিতে পারে না।

মায়া! কি ভীষণ মায়া!

সতেরো.

রাজকীয় বাড়িটাতেই হয়েছে রুদ্রের রিসেপশনের আয়োজন। রুদ্র এবং কেয়ার রিসেপশন। নতুন কনে কেয়া। এ বাড়ির নতুন বউ।

কি ভীষণ মানিয়েছে মেয়েটাকে রুদ্রের পাশে! রাতের বুকে যেন ঝলমল করছে নব বিবাহিত দম্পতি। সকল আয়োজন শুধু তাদেরকে ঘিরেই।

অনেক অনেক দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখে নীরা, সকল ভিড় থেকে দূরে। বিবর্ণ নীরা। নিঃসঙ্গ নীরা। ভালোবাস্যার কষ্টে কাঁদতে ভুলে যাওয়া নীরা।

এই বিশাল গ্রহটার বুকে তার যে কোনো আপন জন নেই, আজ যেন অনুভব করে হৃদয়ের প্রতি বিন্দুতে। নিঃস্তব্ধ লাগে আশেপাশের ভীষণ মুখর কোলাহলকেও, যেন

পৃথিবীতে সে ছাড়া নেই কোনো জীবন্ত প্রাণী। একাকীত্বের ভয়ে কাঁপন জাগে অস্তিত্বের রন্ধ্রে রন্ধ্রে...

মরে যেতে ইচ্ছা করেনা নীরার। একটুও না। অথচ জীবনটাকে অসহ্য বোধ হয়। জীবন থেকে হারিয়ে গেছে সামান্যতম আলোর ইশারাটাও। বেঁচে থাকার বাহানা। পৃথিবীর বুকে নিজেকে ভীষণ অপ্রয়োজনীয় লাগে!

এবং তারপর না জানি কত সহস্র মুহূর্ত পর...

পাশে এসে দাঁড়ায় মুখ ফিরিয়ে নেয়া আপন মানুষদের একজন। অসম্ভব প্রিয় একজন। রাজিয়া বেগম।

'পালিয়ে যা, নীরা। পালিয়ে যা।'

'কোথায় যাবো আমি একা একা?'

'এ বাড়িতেও তো তুই একাই রে! কে আছে এখানে তোর?'

'আপনি আছেন।'

'আমি তো মৃত মানুষ। তুই-ও তাই হবি? পালিয়ে যা। পালিয়ে গিয়ে বেঁচে থাক্। মানুষের মতো বেঁচে থাক্।'

'আমি আর বাঁচতে চাই না, মা।'

'তোকে বাঁচতে হবে। আমার জন্যে বাঁচতে হবে। আমি নিজেকে মেরে ফেলেছি মায়ার বাঁধনে আটকা পড়ে। তুই এ ভুল করিস না।'

'আমি যাবো না!'

'তোকে যেতে হবে। যাবার সময় আমার বিছানার ওপর রাখা ব্যাগটা নিয়ে যাবি। তোর কাজে লাগবে। আমার সবগুলো গয়না আছে।'

'গয়না? আপনার গয়না...'

'কথা বাড়াবি না, নীরা। তোকে আল্লাহর কসম, পালিয়ে যা। এই কারাগ্যার থেকে অনেক দূরে চলে যা।'

'কিন্তু...'

এবার নীরাকে ক্ষণিকের জন্যে বুকে টেনে নেন তিনি। বাঁধ না মানা অশ্রুদের অথবা গোপন করারও চেষ্টা করেন না।

'মা বলে ডাকিস যখন, মায়ের কথা শোন। আর কখনও এ বাড়িতে ফিরে আসিস না। কক্ষনো না, কোনো দিন না।'

'আমি আসবো, মা। আপনার জন্যে আসবো। আপনাকে নিতে আসবো। অবশ্যই আসবো!'

দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় রাজিয়া বেগমের পবিত্র পা জোড়া স্পর্শ করে নীরা। দুচোখ বেয়ে গড়িয়ে নামা অশ্রুরাও স্পর্শ করে রাজিয়া বেগমের পদযুগল।

আঠারো.

একজোড়া অতল কালো চোখ শুধু ঘুরে ফিরে আসে স্মৃতিতে। পুরুষ হৃদয়ে টোকা মারে মেয়ের গালের মিষ্টি টোল, ঠোঁটের তরঙগ। নিজের চুলে যেন অনুভব করতে পারে নরম মেয়েলী আঙুলগুলো। শরীরে যেন স্পর্শ পাওয়া যায় তার বুকের উত্তাপের, হৃদয়ের উষ্ণতার।

এমনকি নতুন কনের মুখটাকেও প্রিয় সেই নারীর মুখই মনে হয় রুদ্রের। নীরার মুখ!

তাকে কেউ বলে দেয়নি, কিন্তু সে জানে। সে জানে যে এই বাড়িটা ছেড়ে চলে গেছে নীরা। মেয়েটার দুচোখে বিদায় সম্ভাষণ স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে সে। জীবনে প্রথম বার পড়তে পেরেছে তার চোখ জোড়ার ভাষা।

কোথায় গেছে? কতদূরে? কতটা মাইলের ব্যবধানে?

জানা নেই।

শুধু জানা আছে যে ক্রমশ শূন্য হয়ে আসছে অস্তিত্বের ভেতরটা। বেঁচে থাকার মানে হয়ে উঠছে অর্থহীন। লিজা হয়তো তার হৃদয়ের রানী। কিন্তু নীরা...নীরা হচ্ছে অস্তিত্বের প্রাণ-নির্যাস!

ক্রমশ ফাঁকা হয় রুদ্র। গাঢ় বিষাদে ডুবে যায় মন কোলাহল মুখর পৃথিবীর অজানা নিঃস্তব্ধতায়। নিস্তেজ হয়ে আসে শরীর মৃত আত্মার মত।

রুদ্রের জানা নেই...

জানা নেই যে এ বোধটাকেই ভালোবাসা বলা হয়ে থাকে!!!

উনিশ

বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে না তার বহু বহু কাল আগে থেকেই। তবুও বেঁচেই ছিলেন। কেননা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার সাহসটিও ভর করেনি অস্তিত্বে।

আজ করে! ভীষণ ভাবে করে।

ব্লেডটা হাতে কব্জির নীলচে-সবুজ রগগুলোকে দেখেন তিনি অপলক। এদের অভ্যন্তরে রক্তের গতিশীলতাকে রুখে দেয়ার ভয়াবহ ইচ্ছা অনুভব করেন তিনি বুকের মাঝে।

রক্তক্ষরণ হতে হতে একসময় হয়তো বোধশূন্য হয়ে আসবে আত্মা-মৃত এই দেহটা। শীতলতা ঘিরে আসবে; হয়তো ক্রমশ নিভে যাবে চোখের আলোটুকু...তখন কি আসবে মৃত্যু? আর সাথে নিয়ে আসবে শান্তি?

কি দারুণ লোভ হয় তাঁর!

নিচে ধুমধামে চলছে রুদ্রের বিয়ের রিসেপশন পার্টি। জীবিত তাঁর খবর নেয়ার সময় যখন কারোর হয় না। মৃত দেহটার খোঁজও কেউ সহসা পাবে না। ভীষণ নিশ্চিন্তে নিজেকে সমর্পণ করা যাবে মৃতুর বাহুডোরে।

এত ভাবনার পরও কোথায় যেন একটুকু আশা এখনও ধুকপুক করে তাঁর বুকের মাঝে। নীরা বলেছে, ফিরে আসবে। তাঁকে নিতে আসবে খোলা আকাশের সীমানায়।

রুদ্র পারেনি তাঁকে আকাশ দিতে। রুদ্র আসেনি! নীরা কি আসবে??

একটি ব্লেড কিংবা একজন নীরাকে বেছে নেওয়ার দ্বিধাদণ্ডের অবসানের অপেক্ষা করেন চরম নিঃসঙ্গ রাজিয়া বেগম!

পরিশিষ্ট

না জানি কি অমোঘ আকর্ষণে তাকিয়ে থাকে নীরা অপলক।

অনেক অনেক অনেক নিচে যমুনার কালো জল অন্ধকারে মাখামাখি। রাতের নির্জনতার সাথে সখ্য করে ব্যস্ততা হারিয়েছে সেতু-সড়কটাও। ক্রমাগত জ্বলছে নিভছে ইয়েলো ক্যাবটার হলদে আলো। ভেতরে ঝিম ধরে বসে থাকা সবুজের মুখটা শুধু অনুভব করা যাচ্ছে আবছা আলোতে।

বিপুল জলরাশির কলকল আওয়াজ যেন সম্মোহন করে রাখে নীরাকে। না জানি কতটা শীতল সেই জল! মৃত্যু কি তেমনই শীথল?

ব্রিজের শরীর থেকে একটি ঝাঁপ...

পেঁজা তুলোর মত হাওয়ায় ভাসবে কি শরীরটা? ক্রমশ ভেসে ভেসে হবে নিম্নগামী মৃত্যুর আকর্ষণে। এবং অতঃপর...

শীতল জলরাশির ভালোবাসায় ডুবে যাবে শরীরটা। চির...চিরকালের মতো! হারিয়ে যাবে মৃত্যুর বুকে। সময়ের অন্ধকারে। মহাকালের অন্তহীন অস্তিত্বে বিলীন হয়ে যাবে চড়ুই পাখি মনের কষ্টনামী ঘুনে পোকারা।

এবং মুক্তি...

ভালোবা স্যার মোহমায়া থেকে! রুদ্র নামের মানুষটা থেকে! বোকা আর অবুঝ হৃদয়টা থেকে!

তবু পারে না নীরা। পারে না নীরা মুক্তি দিতে নিজেকে। সোনার পিঞ্জিরায় বন্দি এক নারী যে ভীষণ ভীষণ অপেক্ষায় আছে তার। সে যে কথা দিয়ে এসেছে তাঁকে!

নিজের অস্তিত্বের টুকরোগুলোকে একটু একটু করে আবার একত্রিত করতে শুরু করে নীরা। একটি ওয়াদা যে তাকে পূরণ করতে হবেই!